প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদ

মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদ

মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

জন্ম : ১৯৩১, মৃত্যু : ৪ নভেম্বর, ১৯৬৩

প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদ

মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

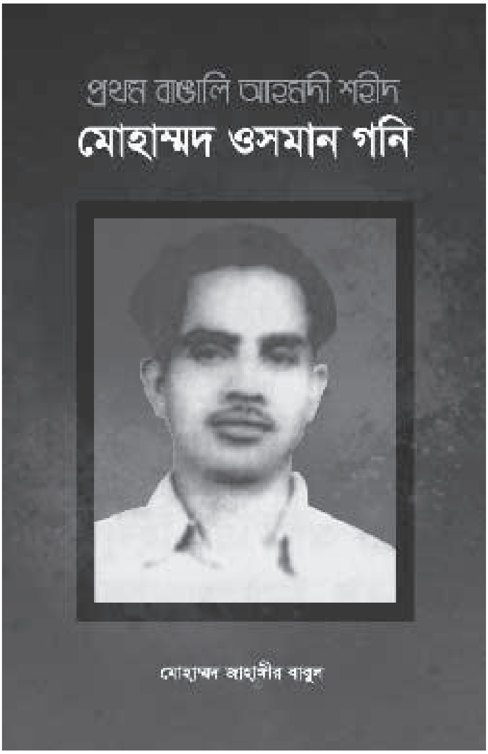

প্রকাশনায় :

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদ
মোহাম্মদ ওসমান গনি

গ্রন্থস্বত্ত্ব	**ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.**
প্রকাশনায়	**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।** ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
লেখক	**মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল**
প্রকাশকাল	১৫ আগস্ট, ২০১৫ / ৩১ শ্রাবণ, ১৪২২
সংখ্যা	১০০০ কপি
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
মুদ্রণে	**বাড-ও-লিভস্** বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Prothom Bangali Ahmadi Shaheed
Mohammad Osman Ghani
(Memoir of Mohammad Osman Ghani the 1st Bangali Ahmadi Shaheed)

Written in Bangla by
Mohammad Jahangir Babul

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
ISBN 978-984-991-109-8

উৎসর্গ

জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম শহীদ– আফগানিস্তানের পুন্যাত্মা হযরত মৌলবি মিঞা আব্দুর রহমান (রা.) যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আফগানি ধর্মান্ধ মোল্লাদের হাতে ১৯০১ সালে শাহাদত বরণ করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– 'তুমি বল, নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করি। আর আমাকে এ-ও আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সব আত্মসমর্পণকারীদের মাঝে প্রথম হই' (সূরা আয্ যুমার, আয়াতঃ ১২-১৩)। এ শিক্ষার আলোকে অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি খোদার রাহে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তন্মধ্যে শাহাদতের জন্যও অনেকে জীবন কুরবানি করেছেন। এতে বাঙালিও আছেন।

বাংলাদেশে জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম শাহাদতের পুরস্কার লাভকারী মোহতরম মোহাম্মদ ওসমান গনি। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে উত্তম বাণিজ্য লাভে সৌভাগ্য পেয়েছেন। ধর্মের সেবায় ১৯৬৩ সালে আত্মোৎসর্গ করে প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাই তাঁর জীবনালেখ্য আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর ধর্ম সেবার কুরবানি আমাদের জন্য অনুকরণীয়। জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল এ পুস্তকটিতে তাঁর ধর্ম সেবার আত্মত্যাগ তুলে ধরেছেন। তাঁর এ কুরবানির মহিমা দেশে বিদেশে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট সমাদৃত হবে আশা করি। লেখক এবং প্রকাশনায় যারা যেভাবে কাজ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
১৫ আগস্ট, ২০১৫

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা’লা তাঁর পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের জন্য চারটি পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। যথা– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। নিজের আমিত্বকে বিসর্জনের মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে যারা নিজেকে বিলিয়ে দেন তাঁরাই এসব পুরস্কারে ভূষিত হন। নফসে মুতমাইন্নায় উপনীত এসব পুণ্যবানরা আল্লাহ্ তা’লার মহিমায় পুরস্কার উত্তরণের ক্রমধারায় সালেহ, শহীদ, সিদ্দীক ও নবীর মর্যাদা লাভে উপনীত হন।

ফলে আখেরী জামানায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবির্ভূত উম্মতি নবী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর অনুবর্তিতায় বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে অনুরূপ অসংখ্য পুণ্যবান ব্যক্তি পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ থেকে বাংলাদেশও বঞ্চিত হয় নি। এ দেশে ১৯৬৩ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৭তম সালানা জলসায় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনি প্রথম শাহাদত বরণ করেন। ফলে বাংলার বুকে আহমদীয়া জামা’তে প্রথম সূচিত হয় শহীদের বারিবর্ষণ। দ্বিতীয় শহীদ জনাব আব্দুর রহিম। পরবর্তীতে শহীদের এ বারিধারায় বাংলার মাটি আরো সিক্ত হয়েছে।

প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদ জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনি এদেশে প্রথম ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক বীর পুরুষ। তাই তাঁর জীবনালেখ্যের আত্মত্যাগের কুরবানির আদর্শ আমাদের জানা প্রয়োজন। সেজন্যই তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের বর্ণাঢ্য আদর্শ তুলে ধরার জন্য আলোচ্য পুস্তকটির রচনার প্রয়াস হয়।

পুস্তকটি আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশের প্রকাশনা বোর্ড-এর পক্ষে মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ্, দেখে দিয়েছেন এবং প্রকাশনা বোর্ড প্রকাশের সম্মতি প্রদান করে। জনাব আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ এবং জনাব ফজল-ই-ইলাহী লেখার কাজে সহযোগিতা করেছেন। জনাব মাহবুব হোসেন, সেক্রেটারি ইশায়াত, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ পুস্তকটি প্রকাশের সার্বিক সহযোগিতা করেন। মাওলানা মামুন-উর-রশীদ প্রুফ দেখায় সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ।

সর্বোপরি হুযূর আকদাস সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) দয়াপরবশ হয়ে পুস্তকটি প্রকাশের সদয় অনুমতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা হুযূর (আই.)-এর সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় দীর্ঘজীবন দান করুন, আমীন।

এ ছাড়া যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দিন, আমীন। পুস্তকটি প্রকাশে ব্যয় নির্বাহ করেছেন শহীদ জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনির ছোট বোন সুফিয়া বেগম সাহেবা। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

লেখাটি ইতঃপূর্বে পাক্ষিক আহমদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে কিছু পরিমার্জন করে উপস্থাপন করা হলো। লেখায় তথ্য সংগ্রহে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তথাপি বইটিতে উপস্থাপিত কোন তথ্যের বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকলে তা সুহৃদ পাঠক জানালে খুশি হবো। আহমদীয়াতের ইতিহাসে প্রকাশিত পুস্তকটি স্মরণীয় হয়ে থাকুক এ কামনা করি।

বিনীত
দোয়ার আরয
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ঢাকা
১৫ আগস্ট, ২০১৫

প্রথম বাঙালি আহমদী শহীদ
মোহাম্মদ ওসমান গনি

সূচিপত্র

১। আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার ১
২। ওসমান গনির জন্ম ও বংশ পরিচয় ৩
৩। বাল্যজীবন ৫
৪। শিক্ষাজীবন ৬
৫। ধর্মের প্রতি অনুরাগ ৯
৬। বয়আত গ্রহণ ১১
৭। চাকুরিজীবন ১৫
৮। জামা'তে খেদমত ১৭
৯। দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমা ২৪
১০। জলসা ও শাহাদতের ঘটনা ৩৪
১১। প্রকাশিত প্রতিবেদন ৫৩
১২। মামলা-মোকদ্দমা ৬৩
১৩। বিভিন্ন ঈমানবর্ধক ঘটনা ৬৫
১৪। স্বজনদের স্মৃতিকথা ৭৬

আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার

বিশ্বস্রষ্টা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় বিশ্বের সবকিছু বিরাজমান। তাঁর সকল সৃষ্টিই মানব কল্যাণে নিয়োজিত। আবার তাঁর ইচ্ছায় সবকিছুর ধ্বংস অনিবার্য। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান দিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করেছি (সূরা আত্ তীন, ৯৫:৫)।

এজন্য মানুষের বুদ্ধিমত্তা, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার উৎকর্ষতা অন্য সব জীব হতে ভিন্ন ও উৎকৃষ্টতর। শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা ও অধিকার সৃষ্টির অন্যান্য জীব হতে সর্বাধিক এবং স্রষ্টার সাথে প্রেমময় সম্পর্ক সর্বোত্তম। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এ সর্বাধিক ভালোবাসার জীবটিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ দানে মানুষকে ঐশী প্রেরণা ও প্রবৃত্তির তাড়না দিয়ে সৃষ্টি করে ভাল মন্দের মধ্যে বিচার করার ক্ষমতাসহ কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই মানুষের সত্তায় বিরাজমান গুণাবলী সর্বদা তাঁকে সৃষ্টির রহস্য, স্রষ্টার কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং অন্য সব সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের জন্ম, বেঁচে থাকা ও মৃত্যু সবই মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। মানুষের আমিত্ব বলে কিছুই নেই– এ চিরন্তন সত্যটি তাঁর অনুভূতিতে জাগ্রত হয়। মানুষের মধ্যে পবিত্র ব্যক্তিরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে ঐশী প্রেরণা ও প্রজ্ঞা লাভে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা–

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

অর্থাৎ, আর লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদেরকে বিক্রি করে দেয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ (এরূপ) বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল (সূরা আল্ বাকারা, ২:২০৮)।

তাই নিজের আমিত্বকে বিসর্জনে খোদার দেয়া দেহ ও মন-প্রাণ সর্বদা তাঁর তরে বিলিয়ে দেয়া এবং তাঁর গুণকীর্তন করা মানবের ইহজীবনের স্বার্থকতা

এবং পরকালে স্বর্গ-সুখের আবাসন প্রাপ্তির যোগ্যতা। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাই মানবের ইবাদতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থাৎ, আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্ যারিয়াত, ৫১:৫৭)।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে যারা বেশি সচেষ্ট, আল্লাহ্ তা'লার রহমত প্রাপ্ত হন তারা তত বেশি। এসব পুণ্যাত্মারা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করে খোদার সান্নিধ্য লাভ করেন। তাদের মাঝে খোদার সিফতের বিকাশ ঘটে। আর এসব সার্থক ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন পুরস্কার। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সেই সব পুরস্কার হলো–

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐসব লোকের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণের মধ্যে এবং তারাই সাথী হিসেবে উত্তম (সূরা আন্ নিসা, ৪:৭০)।

হাইউল কাইয়ুম–চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী খোদা মানুষের প্রতি তাঁর রহমত নাযিলের শুরুতে– বান্দার সাথে তাঁর প্রেমসূত্রের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ.)-কে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করেন। পরবর্তীতে একত্ববাদের শিক্ষার ক্রমধারায় যুগে যুগে অসংখ্য নবী রসূলের আগমন হয়েছে এবং তাঁদের অনুবর্তীতায় অনেক আদম সন্তান সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ হওয়ার পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর আখেরী জামানায় উম্মতি নবী হিসেবে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিষ্যত্ব বরণ করে অনেক পুণ্যাত্মা এসব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং এর ধারা প্রবাহমান রয়েছে।

জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম শাহাদতের পুরস্কার লাভের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন আফগানিস্তানের হযরত মৌলবি মিঞা আব্দুর রহমান (রা.)। তিনি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় ১৯০১ সালে নির্মম ভাবে শহীদ হন। তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে শহীদ করা হয়। দ্বিতীয় জন আফগানিস্তানের খ্যাতমান ব্যক্তিত্ব সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ (রা.)। তিনি ১৯০৩ সালে মোল্লাদের দ্বারা বাদশাহের আদেশে প্রস্তরাঘাতে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন।

অনুরূপভাবে ধর্ম রক্ষার খাতিরে বাংলার মাটিও শহীদের রক্তে ভিজে উঠেছে। ১৯৬৩ সালে বাংলার বুকে প্রথম শাহাদত লাভের সৌভাগ্য অর্জনকারী ব্যক্তি মোহাম্মদ ওসমান গনি। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত আহমদীয়া জামা'তের বার্ষিক জলসায় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে শাহাদত বরণ করেন। বাংলার বুকে সূচিত হয় শহীদের বারিবর্ষণের প্রথম ঘটনা।

ওসমান গনির জন্ম ও বংশ পরিচয়

বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম ধুল্যা। এদেশের অন্যান্য গ্রামের মত সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামল ছাঁয়াময় আদর্শ এক পল্লী। বাংলার এমন গ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহেই কবি মনের আনন্দে গেয়েছেন–

আমাদের গ্রামখানি ছবির মতন
মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন

তবে ধুল্যা গ্রামে শুধু মাটির তলায় নয়, মাটির ওপরেও রতন ছড়িয়ে ছিল। এ গ্রামের সরকার বাড়ি ব্রিটিশ আমল থেকেই সম্ভ্রান্ত হিসেবে সুপরিচিত। ধর্মপরায়ণ আদর্শ মুসলমানের বাড়ির জবড়ী বেপারীর নাম মশহুর ছিল সুদূর প্রসারি। তাঁর সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ ওমর উদ্দিন সরকারের ঔরসে ১৯৩১ সালে এক শিশুর জন্ম হয়। মাতাপিতা স্বস্নেহে তাঁর নাম রাখেন মোহাম্মদ ওসমান গনি। তিনি ছিলেন পিতার চার ছেলে ও সাত মেয়ে–এগারো জনের মধ্যে তৃতীয় এবং ভাইদের মধ্যে প্রথম। তাঁরা ভাই বোনেরা যথাক্রমে–

১. খায়রুন্নেসা বেগম, ২. তালুকজান বেগম, ৩. মোহাম্মদ ওসমান গনি, ৪. মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন, ৫. সায়েমা খাতুন, ৬. জামিলা খাতুন, ৭. জুহেরা বেগম, ৮. নূরজাহান বেগম, ৯. আজমত আলী, ১০.নবজাত অবস্থায় মারা যান এবং ১১. সুফিয়া বেগম।

শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনির জন্মস্থান,
এ ঘরেই তাঁর জন্ম এবং তাঁদের পরিবার বসবাস করতেন (ছবি-২০১২)।

ওসমান গনির মাতৃকুলও ছিল প্রসিদ্ধ। ধুল্যা গ্রামের নিকটবর্তী নওগাঁও-এর খাঁ বাড়ির সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা সায়েদুন্নেসা খানম তাঁর গর্বিত জননী। ধর্মপরায়ণ আদর্শবতী মহিলা হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল গ্রামে ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে। তিনি তাঁর দশজন সন্তানকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষায় উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। পরোপকার, সমাজসেবা এবং মানুষের দুঃখ কষ্ট লাগবে সহমর্মিতা তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

ওসমান গনির পিতা ওমর উদ্দিন সরকার জ্ঞানবান, বিদ্যানুরাগী ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর পেশা পাটের ব্যবসা ছিল। ঢাকা থেকে কোলকাতায় ছিল তাঁর বিস্তৃতি। তৎকালীন পূর্ববাংলার সোনালী আঁশের ব্যবসায়ী সোনার মানুষ ছিলেন তিনি। দেশী-বিদেশী অনেক সুধীজনের সাথে ছিল তাঁর আন্তরিক সখ্যতা। নিজে উচ্চ শিক্ষিত না হলেও শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। ফলে ওসমান গনি তাঁর অন্যান্য ভাই বোনসহ জাগতিক শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করেন।

বাল্যজীবন

ধার্মিক পিতামাতার দুই কন্যা সন্তানের পর এক পুত্রের জন্ম হয়। ফলে মাতাপিতার বুক ভরে যায়। নাম রাখেন মোহাম্মদ ওসমান গনি। প্রাণ খুলে সবাই দোয়া করেন– 'হে আল্লাহ্! ওসমান গনিকে দীর্ঘ জীবন দান কর, অনেক বড় কর, তার নামের সার্থকতায় আলোকিত মানুষ হিসেবে তেজস্বী কর'। দোয়া ফলপ্রসূ হয়। বাল্যকাল থেকেই ওসমান গনি ধর্মপরায়ণ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী বালক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার বিকাশ ঘটতে থাকে। গ্রামের প্রাণচঞ্চল বালক, দুর্বার, উদ্যমী, পরপোকারী ছেলে হিসেবে সকলের স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। সমবয়সীদের সাথে খেলার মাঠে, পুকুরে সাঁতার কাটায়, খালে-বিলে মাছ ধরা, গাছে উঠে পাখির ছানা ধরে বড় করে পোষ মানানো, সর্বত্রই তাঁর বুদ্ধিমত্তার ছাপ ফুটে উঠে।

মানব সেবা ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। আত্মীয় অনাত্মীয় কেউ অসুস্থ হলে তাদের সেবা শুশ্রুষা ও চিকিৎসার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। রোগীকে গ্রাম্য ডাক্তার কিংবা শহরে অবস্থিত বড় ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতেন। পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো শহর থেকে বড় ডাক্তার ডেকে গ্রামে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। এভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি সর্বদা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সহমর্মিতা জানিয়েছেন। নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। নিজের কাছে অর্থ না থাকলে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি দরিদ্রদের মাঝে ভাগ করে দিতেন।

বাল্যকালে মানব সেবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। গ্রামে তাঁর সমবয়সী অনেকে এ সমিতির সদস্য ছিল। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠা পুরুষ। এ সংগঠানের লক্ষ্য ছিল :–

১। মানব কল্যাণে কাজ করা,

২। ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্য উদ্বদ্ধ করা,

৩। খেলাধূলার ব্যবস্থা করা,

৪। পাঠ অভ্যাসের জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা এবং

৫। সদস্যদেরকে ভাল মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া।

চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়াত লাভের আগে

মানব সেবার উদ্দেশ্যে 'হিলফুল ফুজুল' নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরব ভূমিতে যেভাবে জনসেবা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে মক্কাবাসীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় মানিকগঞ্জের ধুল্যা গ্রামের ওসমান গনিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনুরূপ যুব সংঘ। ঐ সংঘের মাধ্যমে তিনি সমাজ সেবায় যুগপৎ অবদান রাখেন এবং গ্রামবাসীর নিকট সমাদৃত ও প্রশংসিত হন। তিনি সবার নিকট আশীর্বাদপুষ্ট ও স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন।

শিক্ষাজীবন

বিদ্যানুরাগী পিতা ওমর উদ্দিন সরকারের একান্ত আশা প্রচেষ্টা ও দোয়া ছিল তাঁর স্নেহধন্য বড় ছেলে ওসমান গনি উচ্চ শিক্ষায় দেশ বরণ্যের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোক এবং দেশের খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই পিতা বুকভরা আশা নিয়ে তাঁকে নিজ গ্রামে অবস্থিত ভুবন মোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন।

ধুল্যা ভুবন মোহন উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম : ধুল্যা, থানা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ। শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনির এ বিদ্যালয়েই শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয় (ছবি-২০১২)।

এ বিদ্যালয়টি ১৯২০ সালে তৎকালীন এক জমিদার কর্তৃক স্থাপিত। স্কুলে অধ্যয়নে শিক্ষকদের প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা, সহপাঠীদের সাথে সখ্যতা এবং বিনয় ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। স্কুলে খেলাধূলা ও ওয়াজ মাহফিলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনে তাঁর ভূমিকা সকলের দৃষ্টিনন্দিত হয়। লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল লাভ করেন। অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে পিতা তাঁকে বিন্দাবন চন্দ্র রাধা গোবিন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

বিন্দাবন চন্দ্র রাধা গোবিন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়।
গ্রাম : পাকুটিয়া, থানা : নাগরপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং বর্তমান প্রজন্মের এই ছাত্রদের মতই তিনি ছুটির ঘন্টা বাজলে বইখাতা নিয়ে বের হয়ে আসতেন (ছবি-২০১২)।

এ বিদ্যালয়টি তাঁদের বাড়ি থেকে আট কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার অন্তর্গত পাকুটিয়া গ্রামে অবস্থিত। এটি স্থানীয় হিন্দু জমিদার ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কিছুদিন তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে লজিং ছিলেন। গৃহ-শিক্ষক হিসেবে বাড়ির ছেলেমেয়েদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় শিক্ষায় আলোকিত মানুষ হওয়ার পথ প্রদর্শন করেন। ফলে এলাকায় একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি

ছড়িয়ে পড়ে। সকলের সাথে তাঁর গভীর আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। পরে পিতা তাঁকে স্কুলের হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা করেন। তখন তাঁর দু'বছরের ছোট ভাই আওলাদ হোসেনকে এ স্কুলে ভর্তি করা হয়। ফলে দুই ভাই হোষ্টেলে থেকে লেখাপড়া করতে থাকেন।

পাকুটিয়া গ্রামে লেখাপড়ার শুরুতেই তাঁর স্বভাব-সুলভ বিনয়ী ব্যবহার, ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং মানব সেবা প্রত্যক্ষ করে সবাই মুগ্ধ হন। অল্পদিনের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসেবে ছাত্র শিক্ষকদের দৃষ্টি কাড়ে। মসজিদে আযান হলেই নামাযের জন্য ছুটে যেতেন। একাগ্রতার সাথে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। স্কুলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের কর্মসূচিকে সার্থক করতে তিনি অন্যান্যদের সাথে নিরলস কাজ করেন। ছোট ভাইসহ স্কুলের ছেলেদেরকে নামায পড়তে এবং ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানার্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। জাগতিক শিক্ষার চেয়ে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে তাঁর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নের চেয়ে ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠে বেশি মগ্ন থাকেন। ফলে পার্থিব জীবনে প্রথিতযশা হওয়ার প্রতি তাঁর অনীহা জন্মে। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা :

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

অর্থাৎ, আর পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? (সূরা আল্ আনআম, ৬:৩৩)। এই শিক্ষার আলোকে তিনি জ্ঞান অন্বেষণ করতে থাকেন এবং অচিরেই আহমদীয়া জামা'তের শুভ-সংবাদ লাভ করেন। ফলে জামা'তে আহমদীয়ার সত্যতা যাচাইয়ে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করতে থাকেন। এর মাঝেই তিনি ১৯৫১ সালে মানবিক বিভাগ থেকে মেট্রিক (এস. এস. সি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু জাগতিক শিক্ষায় তাঁর অমনোযোগিতার কারণে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারেন নি।

পরবর্তীতে খোদাপ্রেমে বিভোর অনুসন্ধানী মানুষটি জাগতিক শিক্ষার প্রতি আর আকৃষ্ট হননি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যামানায় আবির্ভূত ইমামুজ্জামান হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর দাবির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর মন প্রাণ উদগ্রীব হয়ে পড়ে।

ধর্মের প্রতি অনুরাগ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন– 'নবজাতক শিশুর কানে আযান ও তকবীর বলা হোক, যেন জন্মের সাথে সাথে তাঁর মনে খোদা তা'লার তৌহিদ (একত্ববাদ) ও নবুওয়াতের বাণী পৌঁছে যায়। যার ফলে শারীরিক ক্রমবিকাশের সাথে সাথে খোদার দাঁস হওয়ার যোগ্যতাও তাঁর মধ্যে জন্মাতে আরম্ভ করে'। ফলে ওসমান গনির জন্মের পর তাঁর পবিত্র চিত্তের অভিভাবক দুই কানে যে আযানের ধ্বনি শুনান, তা আঁতুড় ঘরে বোধগম্য না হলেও শৈশব থেকেই প্রতিফলিত হতে থাকে। পবিত্র কুরআন ও নামায শিক্ষার গুরুত্ব জীবনের শুরুতে হৃদয়ঙ্গম হয়। 'আল্লাহু আকবার'– আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই ইত্যাদি ঐশীবাণীর যথার্থতা তাঁর পবিত্র হৃদয়ে দানা বাঁধে। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষানুযায়ী তিনি শৈশব থেকেই ধর্মপরায়ণ ও পবিত্র মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। ইসলামী আকিদা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে সুবোধ বালক হিসেবে তিনি সুপরিচিতি লাভ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, 'আমি আমার মায়ের গর্ভেই কুরআন শুনেছি'। আমাদের ওসমান গনি মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পুণ্যবতী মা যে নামায, রোযাসহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেছেন, তা তাঁর জীবনে প্রস্ফুটিত হয়।

ধুল্যা গ্রামের স্কুলে অধ্যয়নকালে পিতা স্কুলের মৌলবি শিক্ষককে তাঁর বাড়িতে ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য লজিং রাখেন। ফলে ওসমান গনি গৃহ-শিক্ষকের কাছে ধর্মীয় তালিম-তরবিয়ত লাভ করেন। নামায ও কুরআন শিক্ষা থেকে শুরু করে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্নমুখী জ্ঞান আহরণ করেন। এতে করে ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ সৃষ্টি হয়। তিনি গ্রামের বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হতেন। এমনকি দূর-দূরান্তে বিভিন্ন গ্রামে কোন ওয়াজ মাহফিলের খবর পেলে তিনি বিভিন্নজনকে সাথে করে সেথায় ছুটে যেতেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত জেগে অত্যন্ত মনযোগের সাথে সেসব ওয়াজ শুনতেন।

তখন ধর্মীয়-অনুষ্ঠানে আখেরী যামানায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাকে মানার আবশ্যকতার কথা বয়ান করা হতো। এছাড়া

কাদিয়ানীরা কাফের, তারা হযরত রসূল করীম (সা.)-কে শেষ নবী মানে না এবং তাদের কলেমা ভিন্ন ইত্যাদি বয়ান উগ্রবাদী মৌলবিদের নিকট শুনতেন। তবে মৌলবিদের নসিহত এবং বাস্তবে ইসলামের শিক্ষা থেকে তাদের বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাদের মুখের বয়ান ও বাস্তব-আদর্শ ভিন্ন।

সমাজের স্বার্থান্বেষী মৌলবিরা একে অপরের প্রতি কুফরী ফতোয়ার ঝড় তোলে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত। মানুষ পার্থিব জীবনে বিভোর। তাই তিনি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাকে আহরণ এবং ‘সিরাতাল মোস্তাকিম’-এর পথের সন্ধান নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন ও দোয়া করতেন। তাঁর পবিত্র চিত্তের অনুসন্ধানী মনে সত্যতা উদঘাটনের অনুপ্রেরণা জন্মে। কোথায় আছে ঐশী নূরে প্রজ্জ্বলিত মানব জীবনের প্রশান্তির ধর্ম আল-ইসলামের বাস্তব রূপ!

উল্লেখ্য, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিশিষ্ট সাহাবি সুবিখ্যাত আলেম ও কুতুব হযরত পীর সিরাজুল হক নুমানী (রা.) আহমদী জামা’তে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে বড়-পীর ও পবিত্র চিত্তের খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। তাঁর লক্ষাধিক মুরীদ ছিলেন। কিন্তু তিনি পিরালী জীবন ছেড়ে দিয়ে খোদাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে বহু সাধনা করেন। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে অবশেষে আল্লাহ্ তা’লার মহিমায় কাদিয়ান পৌঁছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাক্ষাৎ লাভে তাঁর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

অনুরূপভাবে আমাদের বাঙালি যুবক ওসমান গনি পার্থিব-জীবন সাধনায় লেখাপড়ার প্রতি উদাসীন হয়ে খোদার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টায় বিভোর হয়ে যান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লার দিক নির্দেশনা–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ, আর তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (সূরা আল্ বাকারা, ২:৪৬)-এর আলোকে তিনি সাধনা করতে থাকেন।

অবশেষে আহমদী জামা’তের সন্ধান লাভের ও এর সত্যতা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐশী আলোকে আলোকিত মানুষ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। কেননা আল্লাহ্ তা’লা বলেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন (সূরা আল্ আনকাবুত, ২৯:৭০)।

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থাৎ, আর শান্তি-নিবাসের দিকে আল্লাহ্ তোমাদের ডাক দেন। আর তিনি যাকে চান, সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন (সূরা ইউনুস, ১০:২৬)।

বয়আত গ্রহণ

ওসমান গনির এক মামা ছিলেন নুরুল হক খান। তিনি মানিকগঞ্জ শহরে চাকুরি করতেন। ভাগ্নে ওসমান গনির প্রতি তার ছিল গভীর স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা। ভাগ্নেরও মামার প্রতি ছিল আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা। সময় সুযোগ হলেই তিনি মানিকগঞ্জ শহরে মামার বাসায় যেতেন। মামা তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির পর মানিকগঞ্জ সরকারি কৃষি দপ্তরের সেচ বিভাগে ওভারশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আসাদউল্লাহ্ সাহেব। নোয়াখালী জেলার মানুষ। তিনি ১৯৪৩ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। তিনি উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ–

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

অর্থাৎ, হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে তা লোকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর তুমি তা না করলে তুমি (যেন) তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করলে না। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না (সূরা আল্ মায়েদা, ৫:৬৮)।

তাই সরকারি কর্তব্য পালনের পর তবলিগই তাঁর জীবনের স্বপ্ন সাধনা ছিল। পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির পূর্বে তিনি চব্বিশ পরগনার ঘটিয়ারী শরীফ

নামক স্থানে সরকারি সেচ বিভাগে কর্মরত অবস্থায় তাঁর তবলিগে নোয়াখালীর নাজির আহমদ ভূঞার পিতা মোখলেছুর রহমান ভূঞা আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মানিকগঞ্জে কর্মকালীন সময়ে আসাদউল্লাহ্ সাহেবের সাথে নুরুল হক খানের পরিচয় হয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। ফলে তাকে তিনি আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা সম্পর্কে তবলিগ করেন। পরবর্তীতে তার মাধ্যমে তার ভাগ্নে ওসমান গনির সাথে পরিচয় হয়। বন্ধুর ভাগ্নেকে তিনি আপন ভাগ্নের মতই স্নেহ করতেন। তাকে ইমামুজ্জামানের আবির্ভাবের সত্যতার উপর তবলিগ করতে থাকেন। তখন তিনি নবম কিংবা দশম শ্রেণির ছাত্র। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) জাহির হলে বয়আত করতে হবে এবং কাদিয়ানের দাবিকারক মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল হতে তাঁর ধারণা থাকলেও আসাদউল্লাহ্ সাহেবের তবলিগের শুরুতেই তিনি বিস্মিত হন। মৌলবিদের বয়ান এবং আহমদীয়া জামা'তের দাবির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। জামা'তে আহমদীয়ার দাবি যুক্তিনিষ্ট বলে মনে দানা বাঁধে। তাই তাঁর মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার যে অতৃপ্ত বাসনা ছিল তা আহরণে অনুপ্রেরণা জন্মে। প্রকৃত পক্ষেই আহমদীয়া জামা'তের দাবিকারক সত্যবাদী কি না তা জানার জন্য গবেষণায় মগ্ন হন। আসাদউল্লাহ্ সাহেবের নিকট থেকে জামা'তে আহমদীয়ার বিভিন্ন পুস্তক নিয়ে পাঠ করতে থাকেন। এতে এক রূহানী খাজানার ভান্ডার অনুভব করেন। ঐশী প্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁর পবিত্র মনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী আবির্ভূত ইমামুজ্জামানের দাবির সত্যতা প্রস্ফুটিত হতে থাকে। কোন সবোধ ছাত্র অজানাকে জানার জন্য শিক্ষকের নিকট ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে অধ্যাবসায়ী হয়ে যেমন প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষক অতি স্নেহস্পর্শে উত্তর দেন সেইরূপ দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়েছিল এ দুই খোদা প্রেমিকের মাঝে। অনেক সময় ওসমান গনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আহমদী বিরোধী মৌলবিদের সাথে আলোচনা করে যাচাই করেন। কিন্তু তাদের মতবাদ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের যুক্তির কষ্টিতে অসার প্রমাণিত হয়।

ওসমান গনি সত্যবাদী খোদা ভীরু মানুষ ছিলেন বলেই হয়তো মহান আল্লাহ্ তাকে 'সিরাতাল মোস্তাকিম'-এর পথ প্রদর্শন করেন। কেননা হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। আল কুরআনের ভাষায়–

وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

অর্থাৎ, এবং ধর্ম (শিক্ষা দানের) ক্ষেত্রে আল্লাহ্র চেয়ে উত্তম আর কে? (সূরা আল্ বাকারা, ২:১৩৯)।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত প্রাপ্ত হয় (সূরা আল্ কাহ্ফ, ১৮:১৮)।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, আর আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয় (সূরা ইউনুস, ১০:১০১)।

ফলে পবিত্র চিত্তের মানুষ ওসমান গনির মনে ঐশী জামা'তের সত্যতা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। সকল সংশয় দূর হয়। তিনি ইসলামের প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটনে সক্ষম হন। আল্লাহ্ তা'লার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি হয়। ফলে গনি সাহেব ঐশী নূরের প্রেরণায় ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে আসাদ উল্লাহ্ সাহেবের সাথে ঢাকাস্থ বকশীবাজার দারুত তবলিগে চলে আসেন এবং বয়আত করে 'সিরাতাল মুস্তাকিম'-এর অনুগমনকারী হন। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হয় ৩৩তম সালানা জলসা। প্রাদেশিক আমীর ছিলেন মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।

কিন্তু যে মামার সূত্র ধরে তিনি আহমদীয়াতের শুভসংবাদ লাভ করেন তার তখনও বয়আত করার তৌফিক হয়নি। মামার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজ করতে থাকে। তিনি ভাগ্নের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তবে তাঁর শহীদ হওয়ার নিদর্শন দেখে মামা নুরুল হক খান সাহেব আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

প্রসঙ্গক্রমে তবলিগ পাগল আসাদ উল্লাহ্ সাহেবের জীবন চরিত্রের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁকে প্রত্যক্ষদর্শী নাজির আহমদ ভূইয়া বলেন–

"আমাদের গ্রামের বাড়ি হতে আসাদউল্লাহ্ সাহেবের গ্রামের বাড়ি প্রায় দশ মাইল দূরে। তিনি ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এলে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। এখনো আমার স্মরণ আছে একবার ভরা বর্ষা মৌসুমে তিনি

আমাদের বাড়িতে এলেন দীর্ঘ তিন মাইল পথ কাঁদা-জল ভেঙ্গে প্যান্ট-শার্ট ভিজিয়ে। আমার মা তখন আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী। মোল্লা-মৌলবিদের কথায় মা এতই প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি প্রথম দিকে বাবাকে পাক্কা কাফের মনে করতেন। কাজেই আসাদউল্লাহ্ সাহেব মায়ের দৃষ্টিতে আরও বড় কাফের। এটাইতো স্বাভাবিক। এহেন কাফেরকে পাক করে খাওয়ালে গুনাহ্ হবে। তাই মা পাক করতে রাজী হলেন না। বাবা অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে কোন রকমে পাকের ব্যবস্থা করলেন। আসাদউল্লাহ্ সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ। তাই বিষয়টি হেঁসে উড়িয়ে দিলেন। এক সময় তিনি মানিকগঞ্জে বিএডিসি'র সেচ বিভাগের ওভারশিয়ার ছিলেন। সেচ বিভাগের নিজস্ব খালে একবার খুব মাছ ধরা পড়ে। সাধারণত: এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা এসব খালের মাছ ধরে নিজেরাই খায়। কিন্তু এ মুত্তাকী মানুষটি খালের সব মাছ জেলে দিয়ে ধরিয়ে বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেন।

মানিকগঞ্জে আমি গিয়েছি। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। তাঁর নিকট হতে পবিত্র কুরআনের দরস শুনেছি। সেই সময় তিনি যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি অবস্থানে ছিলেন। তাঁকে বাসায় আমি সাদা থান কাপড়ের লুঙ্গি পরতে দেখেছি। সে লুঙ্গিতে সেলাই থাকতো না। এ ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী আপত্তি উত্থাপন করলে তিনি বলতেন, 'মৃত্যুকে সব সময় স্মরণ রাখতে চাই। তাই সাদা কাপড় পরি'। তিনি বলেন, 'এটা আমাকে কাফনের কাপড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' এ আল্লাহ্ ওয়ালা মানুষটি হয়ত অনুভব করেছিলেন তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তিনি মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। বোধ হয় এর কয়েক বছর পরই অকালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন। (তিনি মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ২৪ আগষ্ট ১৯৫২ তারিখ ইন্তেকাল করেছেন–লেখক) জীবনে তিনি মৃত্যুকে বরণ করে এক নতুন জীবন লাভ করেন।"[১]

চাকুরি জীবন

১৯৫১ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর অভিভাবকরা তাঁকে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বার বার উপদেশ দেন। কিন্তু জাগতিক শিক্ষা লাভে পার্থিব জীবনে প্রথিতযশা হওয়ার প্রতি বরাবরই তাঁর অনীহা ছিল। বিশেষ করে আহমদীয়া জামা'তের দীক্ষা গ্রহণের পর ইসলামের খেদমত তাঁর জীবনের চাওয়া পাওয়া ও স্বপ্ন সাধনায় পরিণত হয়। পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞান আহরণে বাঙালি সমাজে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রত হন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) জাহির হওয়ার সংবাদ নিরলসভাবে প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সংসার বৈরাগী অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট হন। তাই একদিন বাড়িতে কাউকে না বলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

তখন **১৯৫২** সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা হবে শুনে তিনি ঢাকায় নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। কৃতকার্য হন। প্রশিক্ষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় চলে যান। দীর্ঘ একমাস পর পিতার নিকট পত্র লিখেন–'আমি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছি। বর্তমানে কোয়েটায় সেনা প্রশিক্ষণে আছি। দোয়া করবেন ইত্যাদি'। তাঁর পত্র পেয়ে অভিভাবকগণ স্বস্তি বোধ করেন। তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হয়ে তারা চিন্তামুক্ত হন। ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও তাঁর বৈরাগী মন কিছুটা হলেও সাংসারিক হয়েছে– চাকুরিতে যোগ দিয়েছে।

প্রশিক্ষণ শেষে সিপাহী গনি রাওয়ালপিন্ডী ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন সেনানিবাসে চাকুরি করেন এবং যখনই যে সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন নিকটবর্তী আহমদীয়া জামা'তের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর চাকুরির বাঁধা-ধরার ছকে জামা'তে যাওয়া-আসার আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা ছিল না বিধায় তাঁর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো। খাঁচার বন্দী বিহঙ্গ যেমন মুক্তাকাশে উড়তে অস্থিরতা বোধ করে ঠিক সে দৃশ্যপটই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মাঝে। তাই দোয়া করতে থাকেন। অবশেষে তিনি রিজার্ভ ফোর্সে বদলী হন। অধিক ছুটির সুযোগ হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। কখনও ঢাকায় এসে বাঙালিদের মাঝে কীভাবে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে তিনি বিভিন্ন জনের সাথে আলোচনা করতে থাকেন।

বিশেষত বাঙালি খোদ্দামকে রাবওয়ার আদলে তালিম-তরবিয়তে চাঙ্গা করার বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ অবস্থার মাঝে ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকায় বদলী হন। আজিমপুরস্থ সেনাবাহিনী রিক্রুটমেন্ট অফিসে যোগদান করেন। তখন সরকারি কর্তব্য পালনের পর বকশীবাজার দারুত তবলিগই হয় তাঁর কর্ম ব্যস্ততার প্রধান স্থান। জামা'তের খেদমতই হয় জীবনের মূল স্বপ্ন সাধনা। মন প্রাণ সর্বক্ষণ ইসলামের খেদমতে উতলা হয়ে থাকে। কীভাবে এ দেশে আহমদীয়াতের সত্যতা ব্যাপকভাবে প্রচার এবং জামা'ত সম্প্রসারিত করা যায় তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। তাই সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পর জামা'তের কাজে তাঁর মনভরে না। ফলে নিজেকে একাগ্রচিত্তে ধর্মের সেবায় সোপর্দ করার লক্ষ্যে সাত বছর চাকুরি পূর্তির পর ১৯৫৯ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। আজিমপুরস্থ সেনা দপ্তরে মাত্র কয়েকমাস চাকুরি করার পর চাকুরি ছেড়ে দেন। আক্ষরিক অর্থে যীন্দেগী ওয়াক্‌ফকারী না হলেও অনুরূপই জামা'তের খেদমতে নিজেকে নিবেদন করেন।

কিন্তু অভিভাবকদের উপদেশ ছিল-'বাবা তুমি আহমদী হয়েছো, ধর্মের কাজ করছো, তবে তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে, সংসার ধর্ম করতে হবে। বেকার থাকলে কে মেয়ে বিয়ে দিবে! তাই কিছু একটা কর। তোমার ভবিষ্যত চিন্তা করা দরকার'। ফলে গুরুজনের উপদেশ পালনের তাড়নায় ঢাকায় 'মডার্ন মটর'স কোম্পানী'তে চাকুরি নেন। কিন্তু প্রাইভেট চাকুরির কাজের ছকে তাঁর জামা'তের কাজের সময় সুযোগ করা সমস্যা হয়। জামা'তের বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে ঢাকার বাইরে যাবার ক্ষেত্রে ভাটার উপক্রম হয়। এছাড়া এ চাকুরিতে বেতনও ছিল অপরিমিত। তাই অল্প কিছুদিন চাকুরি করার পর ইস্তফা দেন।

পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় একটি মুদির দোকান দিয়ে ছিলেন। কিন্তু নিজে সর্বক্ষণ জামা'তের খেদমতে নিয়োজিত থাকায় কর্মচারির উপর নির্ভরশীল ব্যবসা বেশি দিন টিকে নি। ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই ব্যবসা বন্ধ করে দেন। ফলে সেনাবাহিনী হতে প্রাপ্ত সামান্য পেনশনের টাকাই ছিল তাঁর জীবিকার্জনের একমাত্র সম্বল এবং ইসলামের খেদমতই ছিল জীবনের অবলম্বন। কেননা তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে উত্তম বাণিজ্যের গুপ্তধনের সন্ধান লাভ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের

আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবে? এটা এই, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে (সূরা আস্ সাফ্‌ফ, ৬১:১১-১২)। গনি সাহেব সেই জ্ঞানই রাখতেন।

জামা'তে খেদমত

সমাজে অধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত স্বরূপটি অর্জনে বালক বয়স থেকে তাঁর মাঝে যে তীব্র বাসনা ছিল, যৌবনে এসে সেই ঐশী নেয়ামত লাভের পর তিনি নিজেকে ধর্মের সেবায় সোপর্দ করেন। জামা'তের কাজে ফানাফিল্লাহ্ হয়ে যান। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ, তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এ (ঘোষণা দেয়ারই) আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি আত্মসমর্পনকারীদের (মাঝে) সর্বপ্রথম। (সূরা আল্ আনআম, ৬: ১৬৩-১৬৪)। এর আলোকে তিনি স্বীয় সত্তাকে খোদার পথে উৎসর্গ করেন। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে গ্রামবাসীর নিকট আহমদীয়াতের শুভ সংবাদ নিরলসভাবে প্রচার করা হয়।

কিন্তু অভিভাবকরা অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাদের উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তারা শোকে দুঃখে শোকাভিভূত হয়ে যান। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় উত্তম আদর্শের ছেলেটি কেন এমন হয়ে গেল তা ভেবে বিস্মিত হন। তবে

সবার বদ্ধমূল ধারণা ছিল ওসমান গনি একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। জেনে শুনে কোন অন্যায় করে না। বিপথে চলে না। সে ধোঁকায় পড়ে কাদিয়ানী হয়ে গেছে।

তাঁর মামার বাড়ির লোকজন বলতেন– 'সে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। কেননা কাদিয়ানী জামা'ত ব্রিটিশের প্রবর্তিত।' সমাজের মৌলবিরা ফতোয়া দেয়– 'সে কাফের হয়ে গেছে। এই কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের খাওয়া-দাওয়া ও চলাফেরা না জায়েয।' ফলে তাঁর স্বজনরা এ পথ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে যায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ছিলেন ঈমান ও আমলের পরীক্ষায় পাথরসম শক্ত। একাই বীরত্বের সাথে সবার মোকাবেলা করেন। বিভিন্ন মাওলানাদের সাথে বহাস করেন। আলেম হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক কোন ডিগ্রি না থাকলেও তিনি পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞানে আল্লাহ্ তা'লার মহিমায় বহাস করেছেন। এতে ফেরেশ্তার সহায়তায় ঐশী নিদর্শন প্রস্ফুটিত হয়।

তিনি অনুধাবন করতেন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْاُمُوْرِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে এবং যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছ হতে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের নিকট হতেও তোমরা নিশ্চয় পীড়াদায়ক কথা শ্রবণ করবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর। তাহলে এটা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হবে (সূরা আলে্ ইমরান, ৩:১৮৭)।

একবার পাকুটিয়ায় হাই স্কুলে গিয়ে ছোট ভাই আওলাদ হোসেনসহ ছাত্র শিক্ষকদেরকে আখেরী জামানায় আবির্ভূত প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ জানান। তখন আওলাদ হোসেন বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেট্রিক পরীক্ষার্থী। ১৯৫৩ সালে তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বড় ভাইয়ের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই বড় ভাইকে বলেন– 'আপনি যখন আহমদী জামা'ত সত্য বলে মেনেছেন, আমিও বয়আত

নিব'। অত:পর তিনি বয়আত ফরমে স্বাক্ষর করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। কিন্তু তখনও আহমদীয়া ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তার ভাল জ্ঞান ছিল না। জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) আই. এস. সি-তে অধ্যয়ন কালে বকশীবাজারস্থ দারুত তবলিগে তাঁর আসা যাওয়ার সম্পৃক্ততা হয়। জামা'তী জ্ঞান আহরণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আহমদী জামা'তের খেদমতে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকা প্রবাসী। তাঁর সহধর্মিণী ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বদিউজ্জামান ভূঞার মেয়ে হোসনে আরা বেগম ময়মনসিংহ শহরে জামা'তের মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান করেছেন।

সেনাবাহিনীতে চাকুরিকালে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেবগ্রামের আহমদী যুবক সালাহউদ্দিন চৌধুরী। দু'জনের পরিচয় হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। অতঃপর দুই বাঙালি মিলে জামা'তের খেদমতে কাজ করেন। অধিকন্তু সময় সুযোগ হলেই তিনি রাবওয়া চলে যেতেন। এভাবে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং জামাতের বিশিষ্ট বূযুর্গ সাহাবি ও আলেমগণের সান্নিধ্যে তাঁদের স্নেহস্পর্শ ও দোয়া লাভ করেন। রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ও খোদ্দামের ইজতেমায় যোগদান করে দিনরাত খেদমত করেছেন। অধিকাংশ সময় জলসার নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। জলসার সময় কখনও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দেহরক্ষীর দায়িত্ব একনিষ্ঠতার সাথে পালন করেন। দেশ মাতৃকার অতন্দ্র প্রহরী জামা'তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবেও কাজ করেছেন।

তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সকল বাঙালি রাবওয়ার জলসায় যোগদান করেন, তাঁদেরকে কাছে পেয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। গভীর আন্তরিকতার সাথে তিনি তাদের খেদমত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জামা'ত ও আহমদীদের খোঁজ খবর নিতেন এবং কীভাবে বাঙালি সমাজে আহমদীয়াতের প্রচার করা যায় তা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করতেন। এ সময়ে তিনি উর্দু ভাষা শিক্ষা লাভ করে লিখনীর সম্রাট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রচনাবলী হতে জ্ঞান আহরণের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

সেনাবাহিনী হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত

সময়টি ছিল তাঁর জীবনের সোনাঝরা অধ্যায়। তখন তাঁর কর্মস্থল ছিল দারুত তবলিগ, আর প্রধান কর্ম ছিল জামা'তে সেবাদান। মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে চিড়া, মুড়ি, চাল, ডাল ইত্যাদি শুকনো খাবার নিয়ে আসতেন। দারুত তবলিগের এক টিনের ঘরের একটি ছোট কক্ষে বসবাস করতেন। নিজে পাক করে খেতেন। চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সাহাবিরা ইসলামের খেদমতে যেমন আসহাবে সুফ্ফা হয়ে গিয়েছিলেন, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় তিনিও যেন আসহাবে সুফ্ফায় পরিণত হয়ে ছিলেন।

তৎকালীন প্রাদেশিক আমীর মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান ও মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবসহ জামা'তের নেতৃস্থানীয় বুযুর্গ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভে তাদের স্নেহভাজন ও আশীর্বাদ পুষ্ট ছিলেন তিনি। বিশ্বস্ত উত্তম খাদেম হিসেবে সকলের দৃষ্টি কেড়েছিলেন। দারুত তবলিগের বহুমুখী কাজের তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। হযরত রসূল করীম (সা.)এর বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাক্য শ্রবণে ও আদেশ পালনে যেমন সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, আমাদের ওসমান গনির জীবনেও সেই আদর্শের অনুরূপ মোহতরম প্রাদেশিক আমীর সাহেবের বাক্য শ্রবণে ও আদেশ পালনের একনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়।

সে সময় জামা'তে আহমদীয়ার মরকয রাবওয়া থেকে প্রাদেশিক জলসা কিংবা বিশেষ কর্মোপলক্ষ্যে অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির শুভাগমন হয় বাংলার মাটিতে। তাঁদের অনেকের অভ্যর্থনা ও নিরাপত্তাসহ আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করেছেন ওসমান গনি। তিনি দেশ মাতৃকা রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীতে নিরাপত্তা, নিয়মশৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তীতার যে অনুশীলন করেছিলেন এবং আহমদীয়াতে দীক্ষা গ্রহণের পর খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার যে শিক্ষা লাভ করেন তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি সম্মানিত অতিথিদের সেবাব্রতে কাজ করেন। ভাল উর্দু জানতেন বলেই উর্দুভাষীদের সেবাব্রতে তাঁর সুবিধা হয়। ফলে সবাই তাঁর খেদমতে মুগ্ধ হন। তিনি যে সকল বুযুর্গ আলেমদের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন এবং তাঁদের সেবা করে দোয়া লাভ করেছেন, এর কিছু বিবরণ এখানে উল্লেখ করছি :

৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ তারিখ বাংলার মাটিতে পদার্পন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। সে সময় তিনি নব প্রতিষ্ঠিত নায়েম

ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ। যিনি পরবর্তীকালে চতুর্থ খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ঢাকায় তাঁর নিরাপত্তা ও খেদমতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন সিপাহী যুবক ওসমান গনি।

৪ মে ১৯৬০ তারিখ ঢাকায় শুভাগমন করেন আহমদীয়া জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তাঁর খেদমতেও গনি সাহেব নিয়োজিত ছিলেন।

২১-২৩ এপ্রিল ১৯৬১ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪২তম জলসা উপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ও মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তাদের সেবা প্রদানেও গনি সাহেব দিন-রাত নিরলস কাজ করেছেন।

১৯৬২ সালের ১৪-১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ৪৩তম প্রাদেশিক সালানা জলসার প্রাক্কালে জামা'তের সাত বুযুর্গের শুভাগমন হয় ঢাকায়। তাদের পদার্পনে ঢাকার বকশীবাজারস্থ দারুত তবলিগ ঐশীনূরে আলোকিত হয়ে উঠে। সেই মহীয়ান বুযুর্গরা হলেন−(১) বিশিষ্ট সাহাবি হযরত কুদরতউল্লাহ্ সানোয়ারী (রা.), (২) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), (নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ ও নায়েব সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া), (৩) মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস, (লন্ডন মসজিদের সাবেক ইমাম) (৪) মোহতরম আব্দুল হক রামা, (নাযেম বায়তুল মাল), (৫) মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া (নাযেম ইসলাহ্ ও ইরশাদ), (৬) সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ (উকিলে আলা) এবং (৭) সৈয়দ দাউদ আহমদ (সদর, বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া)।

তখন সিপাহী ওসমান গনি আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁদের খেদমত করেছেন। হৃদয় উজাড় করে দিয়েছেন তাদের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম থেকে শুরু করে সার্বিক সেবাব্রতে। কারও কোন অসুবিধা হয় কি না সে বিষয়ে সজাগ থেকেছেন। ফলে সম্মানিত অতিথিরা তাঁর খেদমতে অভিভূত হয়েছেন, তাঁর জন্য খাস দোয়া করেন। ফলে তিনি বুযুর্গদের দোয়ায় আলোকিত হন।

১৯৬৩ সালের ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ৪৪তম সালানা জলসা। এ

জলসা ছিল ওসমান গনির জীবনের শেষ প্রাদেশিক জলসা। এই জলসার সার্বিক সফলতায় তিনি অন্যন্যদের সাথে অহর্নিশি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশে তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া হযরত সাহেবজাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.), যিনি পরবর্তীকালে খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের মসনদে আসীন হয়েছিলেন, তিনি ছয় সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলসহ ঢাকায় আগমন করেন।

এ দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন– (১) মোহতরম শেখ বশির আহমদ (লাহোর হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি), (২) মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (সম্পাদক, আল ফুরকান এবং মিশর ও প্যালেস্টাইনের সাবেক মোবাল্লেগ), (৩) মোহতরম শেখ মোবারক আহমদ (ইংল্যান্ড ও আফ্রিকার মোবাল্লেগ), (৪) মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ এবং (৫) মোহতরম মাহমুদ আহমদ আনোয়ার হায়দ্রাবাদী। এসব বুযুর্গদের আগমনে জলসা সরগরম ও আনন্দমুখর হয়ে ওঠে।

ওসমান গনি সম্মানিত বুযুর্গদের সান্নিধ্যে তাঁদের অমূল্য ভাষণ ও নসিহত শুনে একদিকে যেমন আবেগাপ্লুত হন, তেমনি অপরদিকে তাঁদের সেবায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে স্নেহস্পর্শ ও দোয়া লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। আলোকিত হন ঐশী নূরে। এরূপ বান্দাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ, যে কেউ ভাল কাজ করবে তাকে এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা আল্ কাসাস, ২৮:৮৫)।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

অর্থাৎ, তিনি যাকে চান আপন রহমতের জন্য বেছে নেন এবং আল্লাহ্ মহা কল্যাণের অধিকারী (সূরা আলে্ ইমরান, ৩:৭৫)। ওসমান গনি ফেরেশ্তাতুল্য এই বুযুর্গদের দোয়ায় আল্লাহ্ তা'লার সেই রহমত ও ফজলের অধিকারী হন।

প্রাদেশিক জলসার পর সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর নেতৃত্বে আগত সম্মানিত অতিথিগণ এদেশের প্রাচীনতম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর করেন। তাদের নিরাপত্তা ও যত্নাদীর কাজে গনি সাহেব তাঁদের সাথে

ছিলেন। এই মহীয়ান অতিথিবৃন্দ ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলষ্টেশনে পৌঁছলে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সাহেব এবং অন্যান্য সদস্যরা প্রাণঢালা সাদর সম্বর্ধনা জানান। ষ্টেশন থেকে মৌলভীপাড়া মসজিদুল মাহদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) আহমদীদের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। ধর্মের জন্য কুরবানির বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এখনও এ অঞ্চলে কেউ সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেনি। সুতরাং চরম ত্যাগের স্বাদ থেকে এ অঞ্চল এখনও বঞ্চিত'।

হুযূর (রাহে.)-এর সেদিনের এ অভিব্যক্তি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন তাঁদের খেদমতে নিবেদিত যুবক ওসমান গনি। তাঁর মনের সাগরে তখন ত্যাগের প্রেরণা উদ্বেলিত হয়। হায়! আমি যদি এ অঞ্চলে প্রথম জীবন দানের মাধ্যমে সেই চরম ত্যাগের স্বাদ লাভ করতে পারতাম!

আকাশের লিখন তাঁর ভাগ্যেই নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এক মাসের মধ্যে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে সোপর্দ করে জীবন বিক্রি করে দেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শহীদের অমূল্য পুরস্কার দানে তাঁর জীবন গ্রহণ করেন। তিনি বাঙালি জাতির মাঝে প্রথম আহমদী শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿١٢﴾

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣﴾

অর্থাৎ, তুমি বল! নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করি। আর আমাকে এও আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সব আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হই (সূরা আয্ যুমার, ৩৯:১২-১৩)। অতএব ওসমান গনি আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যে জীবন দান করে এদেশের আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমা

আহমদীয়া জামা'তের খেদমতে নিবেদিত এক প্রাণ ছিলেন আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আঞ্চলিক কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। জামা'তের বাঙালি যুবকদের জামাতী তালিম তরবিয়তে চাঙ্গা করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬২ সালের ৪-৫ নভেম্বর প্রথম আঞ্চলিক ইজতেমার আয়োজন করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের লোকনাথ টেঙ্কের পাড়ে অনুষ্ঠিত এ ইজতেমায় এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক খাদেম ও তিফল যোগদান করেন।

৪-৫ নভেম্বর, ১৯৬২ সালে প্রথম আঞ্চলিক ইজতেমায় উপস্থিত
মোহতরম মির্যা রফি আহমদ, মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ
এবং মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবসহ অনেকে (ছবি-১৯৬২)।

রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্র। ফলে বাঙালি খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ইজতেমা আনন্দঘন পরিবেশে সরগরম হয়ে উঠে। পরিণত হয় ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলায়। আর এর সফলতায় আঞ্চলিক কায়েদ সাহেবের সাথে যারা নিরলস দিনরাত কাজ করেন তাদের মধ্যে একজন ওসমান গনি।

তিনি সৈনিকের চাকুরিকালে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত খোদ্দামের ইজতেমায় যোগদান করে যে শিক্ষা ও তালিম-তরবিয়ত লাভ করেছিলেন, তার আদলে বঙ্গভূমিতে অনুষ্ঠিত ইজতেমাকে আঞ্চলিক কায়েদ সাহেবের সহযোগিতায় সতীর্থ বন্ধুদের নিয়ে ঢেলে সাজিয়ে তুলেন। ফলে ইজতেমা সার্বিকভাবে সার্থক, সফল ও প্রাণবন্ত হয়। তখন গনি সাহেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার সেক্রেটারি তবলিগ ও পাক্ষিক আহমদীর ম্যানেজারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অনুরূপভাবে পরবর্তী বছর ২-৩ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখে দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমার আয়োজন করা হয়। এই ইজতেমাকে আরো জাঁকজমকভাবে সার্থক ও সফল করার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় খাদেমদের সাথে ওসমান গনির ওপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কর্ম পরিকল্পনা ছিল ইজতেমার পূর্বে ওসমান গনি আঞ্চলিক কায়েদ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সাথে ইজতেমার জন্য তাঁবুসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবেন। ইজতেমা ও জলসার ব্যবস্থাপনায় তিনি কাজ করবেন। ঐ তাঁবুগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এক আহমদী ব্যবসায়ী ভ্রাতার। সেজন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ খাদেম ওসমান গনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জনাব শহীদুর রহমানের নিকট ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পত্র লিখেন– 'ভাই সাহেব! এবারে ইজতেমা আরও জাঁকজমকভাবে আয়োজন করতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে এবং অধিক সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতির ব্যবস্থা করবেন। আমি অনুষ্ঠানের দু'দিন পূর্বে তাঁবু নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছাবো (ইনশাআল্লাহ্)'।

তাই মালামালগুলি বকশীবাজারে প্রস্তুত রেখে প্রয়োজনীয় কাপড় ও মাতা-পিতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আসতে নিজ বাড়ি মানিকগঞ্জ যান।৩১ অক্টোবর ১৯৬৩ তারিখ বৃহস্পতিবার ফজর নামায আদায়ের পর ওসমান গনি ঢাকায় আসার জন্য প্রস্তুতি নেন। তিনি ছোট বোন সুফিয়া বেগমকে বলেন– 'আমার জন্য কয়েকটি আটার রুটি ও হালুয়া তৈরী করে একটি রুমালে বেঁধে দাও, দুপুরে খেতে হবে।' তাঁর ব্যবহৃত লাল ও ধূসর রঙ্গের সুটকেসটিতে নিজেই প্রয়োজনীয় কাপড়, একটি প্লেট ও একটি গ্লাস গুছিয়ে নেন। কিন্তু প্রকৃতি হঠাৎ বৈরী হয়ে উঠে। শুরু হয় মুষলধারায় বৃষ্টি। সাথে ঝড়ো হাওয়া।

ঘর থেকে বের হওয়া দায়। মাতা-পিতা এ অবস্থায় বের হতে বারণ করলেন। কিন্তু ঐশী জামা'তের ডাকে কুরবানির জন্য সদা প্রস্তুত ওসমান গনিকে রুখবে কে? সবই তুচ্ছ খোদার রাহ্ ছাড়া। প্রয়োজনে মসীহের জামা'তের ডাকে বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়ে পার হতেও ব্যাকুল তিনি। তাই পিতাকে বলেন– 'ইজতেমার বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমার ওপর। আঞ্চলিক কায়েদ সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁর সাথে আজকেই আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে হবে।

সুতরাং দুপুরের মধ্যে ঢাকার বকশীবাজার দারুত তবলিগে পৌঁছতে হবে'। ছোট ভাই-বোনেরা আগলে ধরে বললেন– 'ভাইজান আপনি কবে আসবেন'? তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ওসমান গনি বললেন– 'ইজতেমা ও জলসার পর আগামী মঙ্গলবার চলে আসবো, (ইনশাআল্লাহ্) দোয়া করো।' এই বলে আল্লাহ্‌র নামে অঝোর বৃষ্টির মাঝে সুটকেস ও ছাতা হাতে ঘর থেকে বের হলেন। ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে নির্ধারিত সময়েই দারুত তবলিগে পৌঁছলেন। সেদিন বিকেলে গ্রীনএরো ট্রেনে আঞ্চলিক কায়েদ সাহেবের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যান। তখন আলেমুল গায়েব আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কেউ জানত না খোদার রাহে ঘর ছাড়া এই ছেলে আর মাতৃক্রোড়ে ফিরবে না। ঢাকার দারুত তবলিগ তাঁর পদচারণায় আর মুখরিত হবে না। জামা'তে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের ব্যবস্থাপনায় তাঁর উদ্যম ও সাধনা পরিলক্ষিত হবে না। তিনি শহীদের পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শহীদের মুকুট লাভের সৌভাগ্যশালী হবেন। আকাশের লিখন তাঁর ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অর্থাৎ, আর অদৃশ্যের বিষয়াবলীর চাবি তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া তা কেউ জানেন না এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন (সূরা আল্ আনআম, ৬:৬০)।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

অর্থাৎ, যে-ই আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ চায় (তার জন্য) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসবে। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (সূরা আল্ আন্‌কাবুত, ২৯:৬)।

লোকনাথ টেঙ্কেরপাড়ে প্রবেশের গেট। এ মাঠেই ইজতেমা ও জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
ছবিতে বাম দিক থেকে সর্বজনাব– (১) মাজেদ আহমদ ভূঁইয়া, (২) লেখক,
(৩) মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
(৪) ফরিদ আহমদ এবং (৫) মনোয়ার আহমদ (ছবি-২০০৮)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রাণ-কেন্দ্রে অবস্থিত লোকনাথ টেঙ্কেরপাড়। এটা রিপাবলিক স্কোয়ার নামেও পরিচিতি। বিরাট দীঘির দক্ষিণে শানবাঁধানো ঘাট। স্বচ্ছ জলে ভরা দীঘি। দীঘির দক্ষিণে মাঠ। মাঠের পশ্চিমে পুকুর। মাঠের বিভিন্ন স্থানে শতবর্ষী বড় বড় কয়েকটি রেইনট্রি গাছের ছায়া যেন পথচারিকে হাতছানী দিয়ে ডাকে। ক্লান্ত পথিক দুপুরে বিশ্রাম নেয়। একটু প্রশান্তি পায়। এমন মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের মাঝে ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার আয়োজন হয়। ইতোপূর্বে স্থানীয় জামা'তের অনেকগুলি সালানা জলসাও এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার ইজতেমার পর জলসা হবে। উপরন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদীরা এখানেই ঈদের নামায পড়েন। মাঠে পর্দার বেষ্টনী দিয়ে নারী-পুরুষের পৃথক নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সরকারি মালিকানাধীন এই স্থানটি আশেকে মসীহের পদচারণায় ধন্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনেক বুযুর্গাণের পদধূলি পড়েছে এখানে। তাদের দোয়ায়

লোকনাথ টেঙ্কেরপাড় সিক্ত। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সাথে ফেরেশ্‌তারা বিচরণ করে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ, আকাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন খোদা তা'লার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও তাঁর গৌরব ও পবিত্রতার ঘোষণা করছে। (সূরা আল্ জুমু'আ, ৬২:২)। তাই খোদা তা'লার গুণকীর্তনের জন্য আশেকে মসীহরা ইজতেমা ও জলসার আয়োজন করে।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমায় আগত মেহমানগণকে
স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুতি (ছবি-১৯৬৩)।

ইজতেমার পূর্ব দিন অর্থাৎ ১ নভেম্বর গনি সাহেব স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব ফরিদ আহমদ এবং নিবেদিত খাদেম জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, শহীদুর রহমান, আব্দুল আউয়াল, আনোয়ার হোসেন, আহমদ মিঞা প্রমুখের সাথে প্যান্ডেল টাঙ্গানোর কাজ করেন। বিভিন্ন মজলিস অনুযায়ী তাঁবু টাঙ্গানো হয় এবং অনুষ্ঠানের জন্য একটি ষ্টেজ তৈরী করা হয়। ইজতেমাগাহ্ রাবওয়ার আদলে ঢেলে সাজানো হয়। মেহমানদের স্বাগত জানাতে মাঠের প্রবেশ পথে তৈরী করা হয় একটি সুন্দর সুরম্য তোরণ। আর এসব কাজে সক্রিয় দিকনির্দেশনা দেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, সদর মুরব্বী। আরো সহযোগী ছিলেন সহকারী আঞ্চলিক

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমায় বিভিন্ন মজলিসের সারিবদ্ধ তাঁবু (ছবি-১৯৬৩)।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠানের মাঠ ও বিভিন্ন মজলিসের তাঁবু।
এতে আতফালও উপস্থিত ছিল (ছবি-১৯৬৩)।

কায়েদ সৈয়দ সোহেল আহমদ সি এস পি এবং ঢাকার জেলা কায়েদ লতিফ আহমদ তাহের। শেষ দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। গনি সাহেব ইজতেমার কর্মসূচিকে সার্বিকভাবে স্বার্থক ও সফল করে তুলতে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেন। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি কাজ করেন। মেহমানদের থাকা খাওয়া থেকে শুরু করে সার্বিক ব্যবস্থপনায় তাঁর ভূমিকা ছিল। নেক কাজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আবেগাপ্লুত হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমায় চট্টগ্রাম মজলিসের তাঁবুতে অংশগ্রহণকারীগণ (ছবি-১৯৬৩)।

জলসার পর ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া মালপত্র পুনরায় ঢাকায় নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁরই ওপর অর্পিত ছিল। এ কারণে তিনি বন্ধুবর শহীদুর রহমান সাহেবকে বলেন– জলসা সমাপ্তির পরে সোমবার রাতেই মালামাল নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাবো। সুতরাং যথাসময়ে মাল-সামান গুছিয়ে দিবেন।

সেদিন ইজতেমার দৃশ্যপট দেখে অনেক পথচারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেকে তাঁবু টাঙ্গানো দেখে প্রথমে মনে করেন, এখানে হয়তো সেনাবাহিনীর কোন মহড়া হচ্ছে। আবার কিশোর বয়সের ছেলেদের প্রাণ চাঞ্চল্যতার দৌড়-ঝাপ দেখে মনে করেন এখানে হয়তো স্কাউটের জাম্বুরী হচ্ছে। কিন্তু না, তা ছিল চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর এবং সুদূর সুন্দরবন থেকে আগত আহমদী যুবকদের মিলন মেলার হাট। ঐশী প্রেমিকদের বার্ষিক সম্মেলন। নিজের আত্মশুদ্ধি ও অপরকে খোদামুখী করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ।

ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীদের খাবার প্লেট ও গ্লাস নিয়ে আসার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু অনেকেই ভুলে যান। এমনই একজন ভৈরববাজারের নবদীক্ষিত যুবক এ কে রেজাউল করীম, যিনি শেষ বয়সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের উমুরে আমা ছিলেন। তিনি বলেন– 'গনি ভাই, আমার তো প্লেট

আনা হয় নি', উত্তরে তিনি বলেন– 'কোন সমস্যা নেই, আমার প্লেট আছে। আপনি আমার প্লেটে খাবেন।' বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। যাদের প্লেট ও গ্লাস ছিল না তাদের সন্ধান করে যাদের প্লেট ছিল, তাদের থেকে নিয়ে তিনি খাবারের ব্যবস্থা করেন। নিজের প্লেটকে অন্যের সেবায় বিলিয়ে দেন। অতিথি সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে অনেকে (ছবি-১৯৬৩)।

মহান আল্লাহ্‌র মহিমায় ঐশী প্রেমিকদের এ মিলন মেলার ইজতেমা আশাতীতভাবে সার্থক ও সফল হয়। জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গদের নসিহতমূলক বক্তৃতা, খোদ্দাম ও আতফালদের নেক কাজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দৃঢ়তায় সকলেই অভিভুত হন। সবাই দাঁড়িয়ে খোদ্দামের আহাদনামা পাঠে ইসলামের খেদমতে নিজের জান, মাল, সময় ও ইজ্জত কুরবানির জন্য পুনরায় সংকল্পবদ্ধ হন। অতঃপর হৃদয়গ্রাহী ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ৩ নভেম্বর বিকেলে ওসমান গনির জীবনের শেষ ইজতেমার মিলন মেলার হাট ভাঙ্গে।

এ ইজতেমায় নবগঠিত জামা'ত সুন্দরবন থেকে জনাব আবু কাউসার, জি এম আবু সৈয়দ গাজী, এস এম আনসারউদ্দিন, ঈমান ক্বারী খোদ্দাম এবং এস, এম আব্দুল আজিজ তিফল যোগদান করেছিলেন।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ইজতেমায় উপস্থিত ক'জন। ছবিতে বাম দিক থেকে সর্বজনাব–
(১) মৌলবি শামসুজ্জামান, (২) ডা. আনোয়ার হোসেন, (৩) লতিফ আহমদ তাহের,
(৪) মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, (৫) আজিজ আহমদ এবং
(৬) হারুন কাহলুন (ছবি-১৯৬৩)।

ইজতেমায় উপস্থিত আঞ্চলিক কায়েদ আহমদ তৌফিক চৌধুরীর সাথে ক'জন (ছবি-১৯৬৩)।

কিন্তু তাদের মধ্যে একজন অসুস্থ হলে ইজতেমার পর তাদের বাড়ি চলে যাবার প্রয়োজন হয়। আর অসুস্থ রোগীর সেবা শুশ্রূষা এবং তাদেরকে টিকেট কেটে ট্রেনে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন ওসমান গনি। তিনি মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবসহ তাদেরকে ঢাকাগামী ট্রেনে তুলে দেন। সবার সাথে কোলাকুলী করে হাসিমুখে বিদায় জানান এবং দোয়ার আরয করেন।

ইজতেমায় উপস্থিত সদস্যগণ বক্তব্য শুনছেন (ছবি-১৯৬৩)।

সেদিনের তিফল আজকের প্রৌঢ়ত্বের এস এম আব্দুল আজিজ এবং এস এম আনসারউদ্দিনের নিকট গনি সাহেবের সেই দিনের স্মৃতি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। ধর্মের সেবায় নিজেকে সোপর্দকারী উত্তম খাদেম গনি সাহেবের নফসে মুতমাইন্নায় উপনীত পবিত্র আত্মা জামা'তের কাজে উত্তরোত্তর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

অর্থাৎ, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা আল্ মুজাদেলা, ৫৮:২৩)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ

করে। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে (সূরা আর রা'দ, ১৩:২৯)।

গনি সাহেবের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রশান্তি লাভ করেছিল। তাঁর মাঝে খোদা তা'লার সিফতের গুণাবলী বিকশিত হয়। আর এসব বান্দাদের জন্যই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার নির্ধারিত আছে–

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তারা অনুগ্রহ ও আশিস লাভের সুসংবাদ পায় এবং এ (সুসংবাদও পায়) আল্লাহ্ মু'মিনদের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭২)।

জলসা ও শাহাদতের ঘটনা

দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার ইজতেমা ৩ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখ বিকালে সমাপ্তির পর বাদ মাগরিব থেকে শুরু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা। এ মহতী জলসার অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সৈয়দ সোহেল আহমদ সি এস পি । তখন তিনি পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ের উপ-সচিব ছিলেন। পরবর্তীতে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ছিলেন। অধিবেশনের কর্মসূচি পরিচালনা করেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। পূর্বে ইজতেমার পর দিন ৪ নভেম্বর সকাল থেকে জলসা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করা হয়। ইজতেমা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে জলসা ইজতেমার পরপরই করা হয়।

উপস্থিত খোদ্দাম ও আতফাল ছাড়া জলসা শুরুর প্রাক্কালে অনেক আনসার, লাজনা ও নাসেরাত যোগদান করেন। লাজনাদের জন্য পৃথক তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়। জলসাগাহ প্রায় চারশত ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলায় সরগরম হয়ে উঠে। সকলই হৃদয়ের উচ্ছাসে আনন্দ উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। একে অপরের সাথে আলিঙ্গনে প্রাণে প্রাণে মিশে যান। তখন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির উপস্থিতির লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞাপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বহুল প্রচার করা হয়। সেই ঐতিহাসিক বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ :–

বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম।
নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল করিম ওআলা আবদিহিল মসিহেল মওউদ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদিয়ার ৪৭তম
বার্ষিক ধর্ম্মীয় সম্মেলন।

স্থান—রিপাবলিক স্কোয়ার (লোকনাথ ট্যাঙ্ক)

তারিখ—৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৩ ইং।

মোতাবেক— ১৬ ও ১৭ কার্ত্তিক, রোজ—রবিবার ও সোমবার।

সময়—প্রথম দিবস, সন্ধ্যা ৬টা ৮-৩০, ২য় দিবস, সকাল ৮টা ১১-৩০ বৈকাল—২-৩০, ৫-৩০, সন্ধ্যা ৬টা রাত্রি ৮-৩০ মিনিট।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ ধর্ম্ম ছেড়ে দুনিয়াকে পাওয়ার আশায় উন্মাদ হ'য়ে ছুটেছিল। কিন্তু হায়! দুনিয়া আজ বিরূপ হ'য়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে। দিকে দিকে মহাশঙ্কা ও আজরাইলের কাল পাখার ছায়া জগৎকে গ্রাস করার জন্য নিবিড় হয়ে ঘিরে আসছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত মানব সভ্যতা আজ মানব আত্মাকে শান্তি ও জীবনের সন্ধান দিতে পারল না। সারা বিশ্বের মানব আত্মার আকুল কান্না আজ জমাট বেঁধে আকাশ বাতাস আলোড়িত করে ডাকছে 'শান্তি কোথায়'? এহেন দুঃসময়ে মানব জাতির উদ্ধারের একমাত্র উপায় **"ইসলাম অর্থাৎ শান্তি।"**

ইহার পূর্ণরূপ (ইসলামের প্রকৃতরূপ) হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আজ হ'তে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে পুনঃ প্রকাশ করে গেছেন। আহমদিয়ার জামাত আজ ইসলামের সেই রূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেছে। ইসলাম কিভাবে মানব জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে ব্যক্তি ও জাতির সকল অশান্তি ভরিয়ে তুলে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পথ প্রদর্শন করে সে সম্বন্ধে উক্ত সভায় বহু জ্ঞানী ব্যক্তি আলোকপাত করবেন।

জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি—

বিনীত—

গোলাম ছামদানি খাদিম, বি, এল,

চেয়ারম্যান জলসা কমিটি।

মেহের আর্ট প্রেস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) দোয়া করেছেন। হুযুর (আ.) বলেন : "যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করে, খোদা তাদের সাথী হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের উপর দয়া পরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হতে তাদেরকে নিস্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্যসিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তার সেই সকল বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এসব দোয়া তুমি কবুল কর এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় দান কর। কেননা সকল শক্তি-সামর্থের অধিকারী একমাত্র তুমিই আমীন, সুম্মা আমীন।"[২]

ফলে উপস্থিত আশেকে মসীহ্‌গণ সকলেই এ দোয়ার অংশীদারিত্বে আবেগাপ্লুত হন। পার্থিব জীবন ভুলে স্বর্গীয় উন্মাদনায় বিভোর হয়ে এক অতিন্দ্রীয় জগতে প্রবেশ করেন। ঐশী নেয়ামতের স্বাদ লাভ হয়। জলসাগাহে যেন স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ফেরেশ্‌তারা যেন খোদার রহমত বর্ষণে দল বেধে বিচরণ করে। আকাশ থেকে রহমতের বারি বর্ষিত হতে থাকে।

ধর্ম সেবায় আত্মসমর্পণকারী ওসমান গনির মন-প্রাণ পুলকিত হয়ে যায়। তেজোদীপ্ত স্পৃহায় তিনি জলসার বিভিন্ন কাজে নিবেদিত হন। খোদাতে বিলীন হয়ে যায় খোদা প্রদত্ত তাঁর দেহ মন-প্রাণ। নিজের আমিত্ব বিসর্জনের কোরবানির জন্য সমরে ও শান্তিতে প্রস্তুত তিনি। খোদার সাথে উত্তম বাণিজ্য লাভের অনুপ্রেরণায় তাঁর মন-প্রাণ বিগলিত হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

অর্থাৎ, আর লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের জীবন বিক্রি করে দেয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল (সূরা আল্‌ বাকারা, ২:২০৮)। তাই ওসমান গনি খোদার রাহে জীবন বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত হন এবং আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁর কুরবানি গ্রহণে অত্যন্ত মমতাশীল হন।

এমন স্বর্গতুল্য পরিবেশের মাঝে জলসার অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ হয়। বক্তৃতা মালায় প্রথম বক্তা আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তাঁর বক্তৃতার বিষয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আত্ তাক্‌ভীর এর কয়েকটি আয়াত পাঠ করে ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা অকাট্য যুক্তির সাথে আলোকপাত করতে থাকেন। এতে খোদাপ্রেমিদের মাঝে যেন ঐশী বিউগল বাজে। সকলেই গভীর নীরবতায় একনিষ্ঠতার সাথে তা হৃদয়ঙ্গম করতে থাকেন।

লোকনাথ টেঙ্কেরপাড়ের মাঠের পশ্চিম পাশে পরবর্তীতে এ মসজিদ নির্মিত হয়।
এ মসজিদের স্থানেই জলসার স্টেজ ছিল এবং এ মাঠেই জলসা অনুষ্ঠিত হয় (ছবি-২০১২)।

কিন্তু হায়! বক্তৃতা দশ/পনের মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সভায় আক্রমণ করে। এর নেতৃত্ব দেন জামেয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রিন্সিপাল মৌলবি তাজুল ইসলাম। তিনি কিছুদিন পূর্ব থেকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদেরকে কাদিয়ানী জলসায় আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে গণসংযোগ করেন। বিভিন্ন কুফরী ফতোয়ার ঝড় তোলেন। তখনকার তালশহর মাদ্রাসার এক ছাত্রের মুখে আমি পরে শুনেছি মৌলবি তাজুল ইসলামের সেই বিস্ময়কর বিভিন্ন ফতোয়ার কথা।

জলসার আগের দিন রাতে অতি উৎসাহী এক মোখালেফাতকারী রাম-দাসহ এসেছিলেন। তাকে ধরে থানায় সোপর্দ করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ সড়ক বাজার, আমাদের বিরুদ্ধবাদী মাওলানা তাজুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে এখানে সভা হয়। ছবিতে বামদিক থেকে সর্বজনাব– (১) মাজেদ আহমদ ভূঁইয়া, (২) মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, (৩) ফরিদ আহমদ, (৪) লেখক এবং (৫) মনোয়ার আহমদ (ছবি-২০০৮)।

মৌলবি তাজুল ইসলামের আহ্বানে ৩ নভেম্বর বিকেলে শহরের সড়ক বাজারে কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়। তিনি উত্তেজিত বক্তৃতা দিয়ে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাদের প্রথাগত বক্তৃতায় তিনি বলেন– 'কাদিয়ানীরা ইসলামের শত্রু, ইংরেজের দালাল, কাফের, তারা হযরত রসূল করীম (সা.)-কে শেষ নবী মানে না, তাদের কতল করতে পারলে অনেক সওয়াব হবে এবং বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে ইত্যাদি'। তাই সস্তায় বেহেশ্‌ত লাভের আশায় তারা ঐক্যবদ্ধ হন। দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রায় তিন হাজার লোক সড়ক বাজার থেকে মিছিল করে টেঙ্কেরপাড় এসে আক্রমণ করে। শিলাবৃষ্টির মত ইটপাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। লাঠিসোঁটাসহ দেশীয় অস্ত্রে ভয়াবহ আঘাত আনে। উন্মাদনায় মেতে উঠে। রক্ত পিপাসায় মাতাল হয়ে যায়। জলসাগাহের বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করে। তাঁবু ও সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা আনন্দে মাতোয়ারা হয়। আল্লাহ্‌ ও রসূলের নামে হত্যা করার শ্লোগান দিতে থাকে। দশহাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। নিরীহ নিরপরাধ

খোদাপ্রেমিক আশেকে মসীহ্‌রা দিশেহারা, সকলেই হতভম্ব হয়ে যান। আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করতে থাকেন। অনেকে জলসাগাহের চেয়ার মাথায় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ দীঘি ও পুকুরের পানিতে ডুবে নাক জাগিয়ে থাকেন। আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবসহ একদল জলসার ষ্টেজের পিছনের রেইনট্রি গাছের আঁড়ালে আশ্রয় নেন।

লোকনাথ দীঘি, আক্রমণের সময় অনেকে এ দীঘির পানিতে আশ্রয় নেন (ছবি-২০১২)।

কিছু সংখ্যক সেবক জঙ্গে বদরের সেই উদ্দীপিত সিপাহীদের মতো সতীর্থদের রক্ষায় আক্রমণকে প্রতিহত করতে বলিয়ান হয়ে উঠেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিচক্ষণ যুবক ওসমান গনি। তিনি প্রথমে জলসায় উপস্থিত লাজনা ও ছোট ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে যান। তাদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাই স্কুলের পাশ থেকে নিজ নিজ বাড়ি যেতে রিক্সায় তুলে দেন। তাঁর মাঝে ঐশী প্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মন-প্রাণ উতলা হয়ে যায়। তিনি নিজের জীবন দিয়ে নিরীহ আহমদী ভাইয়ের জীবন রক্ষায় মরণ পনে ঝাপিয়ে পড়েন। তখন তাঁর উপলব্ধি হয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা’লার শিক্ষা–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা আল্ মায়েদা, ৫:৩৬)।

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

অর্থাৎ, সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিসর্জন দেয় আল্লাহ্‌র পথে তাদের যুদ্ধ করা উচিত। আর যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, অবশ্যই আমরা তাকে এক মহাপুরস্কার দিব (সূরা আন্ নিসা, ৪:৭৫)।

ওসমান গনি চৌদ্দ'শ বছর পূর্বের সেই খালেদ বিন ওয়ালীদের মত গর্জে উঠেন। তাঁর দেহের পবিত্র রক্ত টগ্‌বগ করতে থাকে। তিনি জলসাগাহের চেয়ার ও লাকড়ী দিয়েই ইট-পাথরের ঢিল এবং বিভিন্ন অস্ত্রের আঘাত থেকে নিজেকে ও সতীর্থদেরকে রক্ষার চেষ্টা করেন। আক্রমণকে প্রতিহত করতে মাঠের গেটের দিকে এগিয়ে যান। আত্মরক্ষায় প্রতিপক্ষের প্রতি আঘাত আনেন। কিন্তু হায়! নরাধম দলের দশ/পনের জন একত্র হয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলে। প্রচন্ড আঘাত হানে তাঁর উপর। তবে আহত হওয়ার পরও তিনি ভীত হন নি। পালানোর চেষ্টা করেন নি। লড়াই চালিয়ে যান। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

অর্থাৎ, আহত হবার পরও যারা আল্লাহ্ ও এ রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মাঝে যারা ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে এদের জন্য রয়েছে এক মহাপুরস্কার (সূরা আলে্ ইমরান, ৩:১৭৩)। ফলে তিনি ঈমানের পরীক্ষায় দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করেন। সেনাবাহিনীতে মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধের যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বাত্মক প্রয়োগে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। অবশেষে ক'জনের উপর্যুপরী প্রচন্ড আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। হযরত রসূল করীম (সা.) তায়েফবাসীর নিকট আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের শিক্ষা প্রচার করতে গিয়ে যেমন শারীরিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর পবিত্র দেহ থেকে রক্ত নির্গত হয়, তেমনি তাঁর মসীহেজ্জামানের শিষ্যত্বগ্রহণকারী একত্ববাদের শিক্ষা প্রচারের কারণে আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর মাথা ফেটে

ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। সতীর্থদের উদ্দেশ্যে কাতরাতে কাতরাতে শেষ কথা বলেন– 'বন্ধুগণ! এখন আমার মৃত্যুতে আর কোন আফসোস নেই। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমি মওলার উদ্দেশ্যে চললাম। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ আপনারা জাগ্রত হোন এবং উঠুন। জামা'তের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করুন। যাতে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয় ত্বরান্বিত হয়'।[৩] অতঃপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

অদূরে লাজনাদের প্যান্ডেলের নিকটবর্তী স্থানে তারুয়া জামা'তের আনসার সদস্য আব্দুর রহিম সাহেব গুরুতর আহত হন। তিনিও আক্রমণকে প্রতিহত করতে মরণ পনে চেষ্টা করেছেন। জলসাগাহের পাকের জন্য রক্ষিত লাকড়ী দিয়ে নিজেকে ও সতীর্থ আহমদী ভাইকে রক্ষায় বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। অবশেষে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কাজে জড়িত সন্ত্রাসীরা আশেকে মসীহ্ আব্দুর রহিমের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান। আকাশে তাঁরও শাহাদত বরণ মঞ্জুরী লাভ করে। তিনিও ওসমান গনির মত সেনাবাহিনীর সাবেক সৈনিক ছিলেন।

আক্রমণকারীদের দুই ঘন্টা সংঘর্ষের পর প্রকৃতি রূঢ় হয়ে ওঠে, প্রচন্ড ঝড় আসে। শুরু হয় বজ্রপাত। ৭০/৮০ কিলোমিটার বেগে ঘুর্ণিঝড় বইতে থাকে। তখন তারা বিভিন্ন আহমদীদের বাড়িতেও আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু দুর্যোগে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া স্থানীয় মহকুমা প্রশাসক শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে। প্রায় অর্ধ শতাধিক আহতের মধ্যে ৮/১০ জন আহতের পবিত্র দেহ ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পড়ে থাকে। অনেকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। এক ঘন্টা পর ঝড়-বৃষ্টি থামে। স্থানীয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানা থেকে পুলিশ আসে নিরব দর্শকের মত। কিন্তু আক্রমণের সময় থানায় খবর পৌঁছালেও পুলিশ জান মাল নিরাপত্তার জন্য আসে নি। বৃষ্টি ভেজা আহতদের পবিত্র দেহ স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হাসপাতালে খালি বেডের তুলনায় রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় মেঝে ও বারান্দায় ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্তু বীরত্বের সাথে লড়াইকারী গুরুতর আহত ওসমান গনির জ্ঞান আর ফিরে নি। পরদিন ৪ নভেম্বর সোমবার সকাল ৭টায় ওসমান গনি তাঁর ইহজীবন ত্যাগ করে অনন্ত

জীবনের পথে পাড়ি জমান– শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। তখন হাসপাতালে তাঁর সেবায় নিয়োজিত জামা'তের সদস্যরা বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বাসুদেব গ্রামের ডাঃ ফজলুর রহমান ভূঞার ছেলে আবিদুর রহমান ভূঞা গভীর শোকে মূর্ছা যান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রাক্তন আমীর খন্দকার সাঈদ আহমদ (আনু মিঞা) তাঁকে সান্তনা দেন।

৪ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২ টায় কড়া পুলিশ পাহারায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিমরাইলকান্দীস্থ তিতাস নদীর পাড়ে পৌর কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। সতীর্থরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে দাফন করেন। গভীর শোকে আবেগাপ্লুত হয়ে দোয়া ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হে খোদা! তুমি তাঁর জীবন কুরবানি কবুল কর। তাঁকে শহীদের উচ্চ মোকাম দান কর। যার প্রতিশ্রুতি তুমি শহীদের জন্য দিয়েছো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিমরাইলকান্দীস্থ পৌর কবরস্থানে প্রবেশের গেট (ছবি-২০০৮)।

সেদিনের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টেঙ্কের পাড়ের দৃশ্যপট প্রকৃতপক্ষে জঙ্গে বদরের আদর্শের অনুরূপ ছিল। চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে উহূদ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) বীরত্বের সাথে লড়াই করে যেরূপ শহীদ হয়েছিলেন, আমাদের বঙ্গবীর ওসমান গনি তারই আদর্শে শহীদ হন। আক্রমনের শুরুতে তিনি উপস্থিত

মাওলানা ফারুক আহমদ সদর মুরব্বীকে বলেছিলেন– 'মাওলানা সাহেব। এখন আর বসে থাকার সময় নেই। নম্বর লাগানোর সময়'। তাই উজ্জীবিত যুবক ওসমান গনি বীরত্বের সাথে লড়াই করে বাঙালিদের মধ্যে শাহাদতের পুরস্কার লাভে এক নম্বর হন। লালন সাইয়ের এক গানের কথা– 'সময় গেলে সাধন হবে না, দিন থাকিতে দিনের সাধন তুমি কেন জানলে না।' আমাদের ওসমান গনি সময় থাকতেই সাধন করেছেন এবং দিন থাকতেই দ্বীনের সাধন করে গেছেন। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তাই রাবওয়া বেহেশতী মাকবেরায় তাঁর নাম ফলক (কদবা) লাগানো হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিমরাইলকান্দীস্থ পৌর কবরস্থান। এখানে সমাহিত
শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি এবং শহীদ আব্দুর রহিম (ছবি-২০১২)।

বাল্যকাল থেকে পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে যৌবনে ইমামুজ্জামানের দীক্ষা গ্রহণে তিনি নিজেকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার পালনে আজীবন কাজ করেন। বয়আতনামা ও খোদ্দামের আহাদনামা পাঠে কুরবানির তাঁর যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূর্ণাঙ্গভাবে পালনে তিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা–

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ

অর্থাৎ, মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছিল। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করেছে)। (সূরা আল্ আহযাব, ৩৩:২৪)। ওসমান গনি পবিত্র কুরআনের এ শিক্ষা পালনে নিজেকে কুরবানি করে দেন।

অপর বীর বাঙালি আব্দুর রহিম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি হাসপাতালে ৫ নভেম্বর ১৯৬৩ সালে ভোররাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনিও খোদা প্রদত্ত শাহাদতের পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। আকাশে তাঁর নাম শহীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাই তিনিও শাহাদতের মুকুট লাভের সৌভাগ্যবান হন। তখন হাসপাতালে তাঁর সন্তানসহ অনেক আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এক হৃদয় বিদারক শোকের মাতম সৃষ্টি হয়, যেন আকাশে কান্নার রোল উঠেছে।

৫ নভেম্বর শহীদ আব্দুর রহিমের পবিত্র মরদেহ আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ মোবারক-এর প্রাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়। তখন আমি আট/নয় বছরের বালক। দৌড়ে চলে যাই শহীদের পবিত্র মরদেহ দেখার জন্য। শ্যামবর্ণের হালকা পাতলা গড়ন হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারার শহীদের দীদার লাভকারীকে সেদিন আমার দেখার সৌভাগ্য হয়। তিনি ঘুমিয়ে আছেন শান্ত হয়ে। আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরও আমার স্মৃতিপটে সেই দৃশ্য অম্লান হয়ে আছে। তাঁকে শহীদ ওসমান গনির পাশে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও জামা'তের সতীর্থরা গভীর শোকে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে বিদায় জানান। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনায় খাস দোয়া করেন।

বৃহৎ আকারের গোরস্থানের সামনের দিকে রাস্তার পাশে পবিত্র শহীদের কবর দেওয়া হয় এবং যুগল শহীদের কবর দু'টি সংরক্ষণের জন্য জামা'ত কর্তৃক পাকা করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত জামা'তে আহমদীয়ার দেশী বিদেশী অনেক বুযুর্গ এ কবর যিয়ারতে আসেন। কিন্তু হায়! হযরত রসূল করীম (সা.) এর হাদিস অনুযায়ী আকাশের নীচের নিকৃষ্ট জীবে পরিণত নিম্নমানের মোখালেফাতকারীরা আশির দশকে কবরগুলি ভেঙ্গে ফেলে। মাটি খুঁড়ে মাটির

নিচের ইটগুলি পর্যন্ত তুলে ফেলা হয়। ফলে কবর দু'টির কোন অস্তিত্ব নেই। শহীদের কবরের পাশে স্থানীয় জামা'তের ক'জন সদস্যের কবর পাকা করা হয়েছিল। মোখালেফাতকারীরা সে কবরগুলিও ভেঙ্গে ফেলে। বর্তমানে উক্ত স্থানে পাকা কবরের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি এই কবরস্থানে আহমদীদের আরও যে ক'টি কবর পাকা ছিল সেগুলিও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সে সময় ১৯৮৭ সালে আহমদীপাড়াস্থ জামা'তের মসজিদ- 'মসজিদ মোবারক' তারা অবৈধভাবে দখল করে নেয়। যা আজও তাদের জবর দখলে আছে।

বলাবাহুল্য, জলসায় আক্রমণের সময় বিরুদ্ধবাদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রবীন সদস্য শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তি শিমরাইলকান্দীর আব্দুস সামাদ মিঞা ও তাঁর বড় ছেলে জহর মিঞাকে জলসাগাহ থেকে ধরে বলপূর্বক নিয়ে যান এবং চার কিলোমিটার দূরে বিরাশার গ্রামে আটক করে রাখে। আহমদীয়াত ত্যাগ করার ও হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মহিমায় পর দিন তারা মুক্তি পান।

কবর ভেঙ্গে ফেলার এ দৃশ্য চোখে দেখলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আমরা সভ্য বলে দাবিদার যুগে অসভ্য বর্বর মানুষের মত ইট সিমেন্টের গড়া জড় পদার্থের কবর পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা অনেক বড় জঘন্য কাজ। তবে অদূর ভবিষ্যতে আহমদীয়াতের বিজয়ের প্রবাহমান ধারায় এ বীর শহীদদের কবর যিয়ারতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ছুটে আসবেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমরাইলকান্দী গ্রামে অবস্থিত পৌর কবরস্থান সরগরম হয়ে উঠবে। আশেকে মসীহদের পদচারণায় তিতাস নদীর পাড় মুখরিত হবে। আর তাঁরা আফসোস করবেন এবং ধিক্কার দিবেন সেই জঘন্য বিরুদ্ধবাদীদেরকে যারা বীর শহীদের কবর ভেঙ্গে অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছে।

তবে বাহ্যিকভাবে ইট সিমেন্টের সংরক্ষিত কবরের কোন চিহ্ন বর্তমানে না থাকলেও শহীদের আত্মাদানে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারীরা চিরকাল জীবিত। স্বর্গ সুখের আনন্দ উল্লাসের মাঝে তাঁরা বাস করেন অনন্তকাল। তাদের আত্মত্যাগের অবদান কোন দিন ম্লান হবে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলো না তারা মৃত।

বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা (তা) উপলব্ধি করতে পারছ না (সূরা আল্ বাকারা, ২:১৫৫)।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٧٠﴾

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তুমি কখনও তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে জীবিত এবং তাদেরকে রিয্‌ক দেয়া হচ্ছে (সূরা আলে্ ইমরান, ৩:১৭০)।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿١٥٨﴾

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা (স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুবরণ কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (যে) ক্ষমা এবং রহমত (তোমরা লাভ করবে) তা থেকে অনেক উত্তম যা তারা জমা করছে (সূরা আলে্ ইমরান, ৩:১৫৮)।

দুই বাংলার প্রথম আহমদীয়া জামা'ত যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি আল্লাহ্ তা'লার মহিমায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাটিতেই প্রথম শহীদের জয় নিশান উড়ে। সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত সফরকালে জামা'তের কুরবানির আবশ্যকতার যে আশা ব্যক্ত করেছিলেন ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম একমাসের মধ্যে শহীদের আত্মত্যাগে তা পূর্ণ করেছেন। গনি সাহেব আল্লাহ্‌র সাথে যে উত্তম বাণিজ্য করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁকে শাহাদতের পুরস্কারের মাল্যে ভূষিত করেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ
وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

অর্থাৎ, জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ

করে এবং তারা (শত্রুকে) হত্যা করে নয়তো তারা (শত্রুর হাতে) নিহত হয়। এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তারই দায়িত্ব যা তওরাত, ইন্‌জীল এবং কুরআনে বর্ণিত আছে। আর নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে ব্যবসা করছ তাতে তোমরা আনন্দিত হও। আর এ-ই হলো মহা সফলতা (সূরা আত্ তওবা, ৯ :১১১)।

গনি সাহেবের শাহাদত লাভের ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলসার পর মঙ্গলবার আর বাড়ি ফিরে যাওয়া হয় নি। মাতা-পিতা ও ভাইবোনদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। এমন কি তাঁর শহীদের রক্ত মাখা পবিত্র দেহ কোন আত্মীয় স্বজনের দেখার সৌভাগ্য হয় নি। ৪ নভেম্বর টেলিগ্রামের মাধ্যমে মৃত্যুর সংবাদটি মানিকগঞ্জে তাঁর নিজ বাড়িতে পৌঁছে। সংবাদ শুনে বাড়িতে গভীর শোকের ছাঁয়া নেমে আসে। কাঁদতে কাঁদতে অনেকে মূর্ছা যান। মাতা নাড়ী ছেড়াধন হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। পিতা ওমরউদ্দিন সরকার তাঁর শ্যালক নূরুল হক খানকে নিয়ে ঢাকার বকশী বাজার দারুত তবলিগে ৪ তারিখ বিকালে ছুটে আসেন। কিন্তু সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে তাঁর মরদেহ দেখা সম্ভব হয় নি। তবে ৪ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত তাঁর আত্মীয় স্বজনের জন্য অপেক্ষা করে তাঁকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়।

সরকার সাহেব ছেলে হারানোর শোকে একদিকে যেমন শোকাভিভূত হন, অপর দিকে ছেলের ধর্ম সেবার আত্মত্যাগের গৌরবগাঁথা কাহিনী শুনে গৌরবান্বিত হন। তাঁর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নিরপরাধ ছেলেটি উগ্রবাদী মোল্লাদের নেতৃত্বে নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার কারণে তিনি আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে ৬ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখ বকশী বাজার দারুত তবলিগে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। বিভিন্ন সময় তাঁর সন্তানদের মধ্যে খায়রুন্নেসা বেগম, তালুকজান বেগম ও সুফিয়া বেগম বয়আত করে আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এ জলসায় ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম শহীদ হওয়ার সাথে যারা আহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ক'জন হলেন সর্বজনাব :– (১) মীর মোহাম্মদ আলী, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ, (২) জনাব মীর আব্দুস সাত্তার, মৌড়াইল, (৩) জনাব সালেহ আহমদ ভূঞা, ক্রোড়া, (৪)

জনাব আনিসুর রহমান ভূঞা, ক্রোড়া, (৫) জনাব আউসাফ আলী, তারুয়া, (৬) মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, আহমদী পাড়া (৭) মোহাম্মদ শাহজাহান মিঞা, রংপুর, (৮) মোতাহার মিঞা, ক্রোড়া, (৯) বশির আহমদ, তালশহর, (১০) খলিলুর রহমান ভূঞা, বাসুদেব, (১১) ডাঃ আবুল কাশেম, তারুয়া, (১২) ছায়দুল হাসান, তারুয়া, (১৩) সবজালী মোল্লা, তারুয়া, (১৪) ডাঃ আব্দুল গফুর, তারুয়া, (১৫) করম আলী, তারুয়া, (১৬) আবদুল গফুর (বাইশা), তারুয়া এবং (১৭) মুন্সি আসাব আলী তারুয়া প্রমুখ।

সেই জলসায় উপস্থিতদের ক'জন। বাম দিক থেকে দাঁড়ানো সর্বজনাব–
(১) মেহের মিঞা, (২) আহমদ মিঞা, (৩) শেখ বশির আহমদ,
(৪) শহিদুল ইসলাম, (৫) মনোয়ার আহমদ, (৬) মোশারফ হোসেন,
(৭) ডা. মোবাশশের আহমদ, (৮) মিরন মিঞা।
বাম দিক থেকে চেয়ারে বসা সর্বজনাব– (১) মতিউর রহমান,
(২) মোহাম্মদ হুমায়ুন লস্কর, (৩) সৈয়দ জসীম আহমদ, (৪) সালাহ উদ্দিন আহমদ,
(৫) আব্দুল আউয়াল মাস্টার এবং (৬) এ.বি.এম. শফিউল আলম বরকত (ছবি-২০১১)।

সেদিন জলসায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ক'জন স্মৃতিচারণে বলেন–

১। জনাব আহমেদুর রহমান

জলসা শুরু হবার পর একটু দূরে দেখি মাদ্রাসার ১০/১২ জন ছাত্র আনাগোনা করছে। মনে হল তাদের কোন দূরভিসন্ধি আছে। আমি তাড়াতাড়ি বিষয়টি এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম সাহেবকে জানাই। নিরাপত্তার জন্য লাজনাদেরকে নিজ নিজ বাড়ি প্রেরণের পরামর্শ দেই। কিছুক্ষণ পরই তারা মিছিল করে এসে আক্রমণ করে। সবাই হতভম্ব হয়ে যায়।

২। জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস

আমি জলসার আগের দিন রাতে স্বপ্নে দেখি আমাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। আমি চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে উঠি। আক্রমণে আহতদেরকে হাসপাতালে ভর্তি এবং সেবা শুশ্রূষার কাজ করি। শহীদ দু'জনের কাফন দাফনের কাজে জড়িত ছিলাম। তাঁরা দু'জনই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাদেরকে হারিয়ে গভীরভাবে শোকাহত হই।

৩। জনাব ফরিদ আহমদ

তখন আমি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কায়েদ ছিলাম। ফলে স্বাভাবিকভাবে খোদ্দামের ইজতেমা ও জলসার ব্যবস্থাপনার কাজের দায়িত্ব আমার ওপর বেশি ছিল। জলসার আক্রমণের সময় প্রতিহত করতে চেষ্টা করি। আমাদের ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে দু'জনকে শহীদ করা হয়। কিন্তু সরকারের নিকট থেকে এর সুবিচার পাইনি। তবে আল্লাহ্ তা' আলার নিকট থেকে এর সুবিচার হবে (ইনশাল্লাহ)।

৪। জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ

জলসাগাহে আক্রমণের সময় আমি বাইরে ছিলাম। খবর পেয়ে ছুটে যাই। আমার আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নিয়ে শুনি তারা নিরাপদে বাড়ি চলে গেছে। হাসপাতালে আহতদের সেবায় নিয়োজিত হই। রাত ১০ টার পর থেকে শহীদ ওসমান গনির অবস্থা অবনতি হতে থাকে। ৪ নভেম্বর সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন বাসুদেব গ্রামের আবিদুর রহমানকে নিয়ে তাঁর পবিত্র মরদেহ বিপরীত দিক থেকে মাথা উত্তর দিকে করে শোয়ানোর ব্যবস্থা করি।

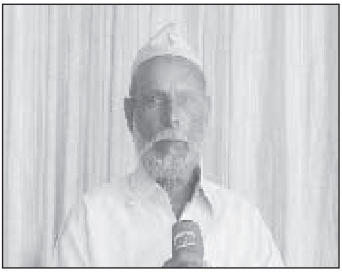

৫। জনাব আব্দুল আউয়াল মাষ্টার

জলসার অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর আমি এক বন্ধুসহ কিছু কেনা কাটার জন্য বের হই। সড়কবাজারে গিয়ে দেখি আমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সভা হচ্ছে। মাওলানা তাজুল ইসলাম উত্তেজিত বক্তৃতা দিচ্ছেন। তারা আমাদের জলসায় আক্রমণ করবেন। তাই তাড়াতাড়ি জলসাগাহে এসে আমাদের মুরব্বীদেরকে জানাই। এর কিছুক্ষণ পরই আক্রমণ করে।

৬। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী (লন্ডন প্রবাসী)

আমি তখন দশ বছরের বালক। পিতা আব্দুল বারী সাহেবের সাথে ছোট বোন আফিয়া বেগমকে নিয়ে জলসায় উপস্থিত হই। হঠাৎ বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমনে ইট-পাটকেল বৃষ্টির মত পড়তে থাকে। আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব মাইকে নারায়ে তকবির ধ্বনী দেন। আমাদের পাশেই ছিলেন শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি। তিনি যে ঢিলগুলি জমা হচ্ছিল তা আক্রমনকারীদের দিকে ছুঁড়ে মারে। তখন তাদের একটি ঢিল আমার কপালে এসে পড়ে এবং রক্ত ঝরতে থাকে। আব্বা আমাকে নিয়ে ফার্মেসিতে যান। কপালে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে বাড়ি চলে যাই। প্রায় এক মাস পর সুস্থ হই।

৭। জনাব মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম

আক্রমণের সময় আমি একটি খাবারের থালা মাথায় দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি। পাশে দেখি ক্রোড়ার আনিসুর রহমানের মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাই। তাঁর মাথায় ৬ টি সেলাই লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অনেক আহমদী ভাই আহত হয়ে হাসপাতালে আসেন। তখন হাসপাতালে এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৮। জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ

শহীদ ওসমান গনির ওপর একসাথে অনেকে আক্রমণ করে। তাঁর মাথা ফেটে যায়। শহীদ আব্দুর রহিমের পেটে আঘাত লাগে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে আঘাত বুঝা যায়নি। হাসপাতালেও তিনি বসে কথা বলেন। তবে পেটের ভিতরে তাঁর রক্তক্ষরণে তিনি গুরুতর আহত হন। ৫ নভেম্বর ভোর রাতে আব্দুর রহীম শহীদের দীদার লাভে মওলার নিকট চলে যান।

প্রকাশিত প্রতিবেদন

বাংলার মাটিতে প্রথম উজ্জীবিত শাহাদতের ঘটনা সে সময়ের দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া জামা'তে আহমদীয়ার মুখপত্র পাক্ষিক আহমদীতে শাহাদতের প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ও নযম প্রকাশিত হয়। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হল :–

দৈনিক সংবাদ

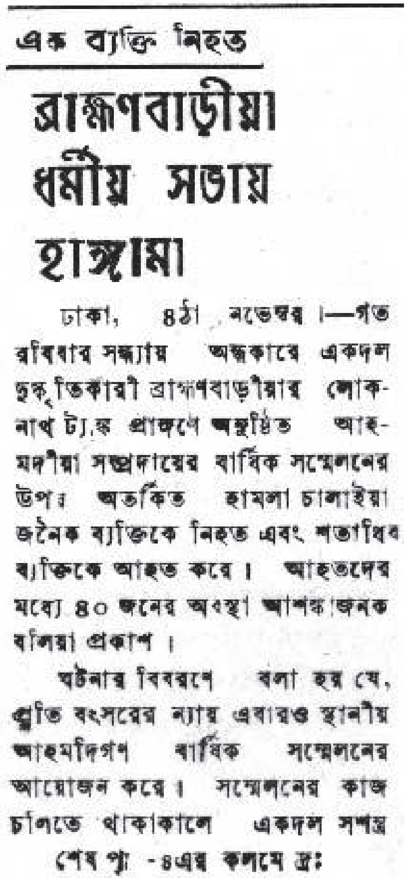

এক ব্যক্তি নিহত

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ধর্মীয় সভায় হাঙ্গামা

ঢাকা, ৪ঠা নভেম্বর।—গত রবিবার সন্ধ্যায় অন্ধকারে একদল দুস্কৃতিকারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লোকনাথ ট্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বার্ষিক সম্মেলনের উপর অতর্কিত হামলা চালাইয়া জনৈক ব্যক্তিকে নিহত এবং শতাধিক ব্যক্তিকে আহত করে। আহতদের মধ্যে ৪০ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে বলা হয় যে, প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও স্থানীয় আহমদিগণ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের কাজ চলিতে থাকাকালে একদল সশস্ত্র

শেষ পৃঃ -৪এর কলমে দ্রঃ

এক ব্যক্তি নিহত
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ধর্মীয় সভায় হাঙ্গামা

ঢাকা, ৪ঠা নভেম্বর, গত রবিবার সন্ধ্যায় অন্ধকারে একদল দুস্কৃতিকারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লোকনাথ ট্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সম্মেলনের উপর অতর্কিত হামলা চালাইয়া জনৈক ব্যক্তিকে নিহত এবং শতাধিক ব্যক্তিকে আহত করে। আহতদের মধ্যে ৪০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে বলা হয় যে, প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও স্থানীয় আহমদীগণ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের কাজ চলিতে থাকাকালে একদল লোক সশস্ত্র হামলা চালাইয়া... ।[৪]

শোক সংবাদ

আমরা অতীব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় ভ্রাতা মানিকগঞ্জ নিবাসী জনাব ওসমান গনি এবং তারুয়া নিবাসী প্রিয় ভ্রাতা জনাব আব্দুর রহিম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহুত ৪৭তম জলসায় শত্রুদের হীন আক্রমণে আহত হয়ে হাসপাতালে যথাক্রমে ৪ ও ৫ নভেম্বর শাহাদত বরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং সকল ভ্রাতা ভগ্নীকে মাগফেরাত কামনা করতে অনুরোধ করছি।[৫]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীদের শান্তিপূর্ণ জলসায় বর্বরোচিত হামলা দু'জন আহমদীর শাহাদত বরণ, শতাধিক আহত

বিগত ৩রা নভেম্বর রোজ রবিবার বাদ মাগরিব পবিত্র কুরআন তেলওয়াতের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বাৎসরিক জলসার কার্য আরম্ভ হলে কয়েক হাজার উত্তেজিত জনতা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র ও ইট-পাটকেলসহ সভাস্থলে ঢুকে নিরস্ত্র আহমদীদের উপর হামলা করে। ফলে শতাধিক আহমদী শিশু ও পুরুষ আহত হন। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জ নিবাসী ওসমান গনি সাহেব ও তারুয়া নিবাসী আবদুর রহিম সাহেব হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদীগণ সরকারের অনুমতি নিয়ে তাদের ৪৭তম বাৎসরিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রিপাবলিক স্কোয়ারে (লোকনাথ ট্যাঙ্কের পারে) অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হতে আগত আহমদীগণ যোগদান করেন। আহমদীদের এই সভার সংবাদ পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ সড়ক বাজারে মৌলবি তাজুল ইসলাম ঐ দিন অপরাহ্নে এক বিরোধী সভার আয়োজন করেন। এ সভায় মৌলবি তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য বক্তাগণ উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীকে আহমদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে থাকেন এবং সকলের নিকট হতে হাত উঠায়ে জেহাদের অঙ্গীকার নেন, ফলে জেহাদের নেশায় উত্তেজিত জনতা লাঠিসোঠাসহ বিভিন্ন মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে আহমদীয়া সম্মেলনে উপস্থিত নিরস্ত্র আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার

উপর হামলা চালায়। এই হাঙ্গামার খবর তড়িৎ গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আরো বহু লোক বিভিন্ন দিক হতে এসে নিরস্ত্র আহমদীদেরকে চতুর্দিক হতে ঘিরে মুষলধারে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে এবং লাঠি চালাতে থাকে। অনুমান দুই ঘন্টা এইরূপ চলার পর বজ্রপাতসহ বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় দুস্কৃতিকারীগণ সরে পড়ে।[৬]

সম্পাদকীয়
ইহাই কি ইসলামী আদর্শ?

গত ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ রিপাবলিক স্কোয়ারে (লোকনাথ ট্যাঙ্ক ময়দানে) আহূত ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বার্ষিক জলসায় আহমদীগণের উপর এক হিংস্র ও জঘন্য আক্রমণ চালানো হয়। সংবাদে প্রকাশ ঐ দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সড়কবাজারে মৌলবি তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে তার অনুচরগণ এক সভার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত সভায় আহমদীয়া মতবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে দারুণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। এতে জনগণকে উত্তেজিত করে আহমদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে তাদের নিকট হতে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়। সন্ধ্যার পর যখন শান্তিপূর্ণভাবে জলসার কার্য আরম্ভ হয় তখন নিরস্ত্র, নির্বিবাদী আহমদীদের উপর এক মারাত্মক হামলা চালানো হয়। উক্ত জলসায় শিশু, বৃদ্ধ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার লোক এদের উপর এক মারাত্মক আক্রমণ চালায়। চতুর্দিক হতে অজস্র ইট-পাটকেল ছুড়তে আরম্ভ করে এবং লাঠি চালাতে থাকে। আহমদীদের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও মালপত্র লুট করে। আক্রমণের ফলে দু'জন আহমদী শাহাদত বরণ করেন। তা'ছাড়া শতাধিক আহমদী আহত হয়। আহতদের মধ্যে অনেক শিশুও আছে। আক্রমণকারীরা এইসব কাজ করার সময় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের নামে শ্লোগান দিতে থাকে। এই জলসাতে কোন বক্তাই কোন ধর্ম, কোন জামাত বা কোন ফেরকার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলেন নাই। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শুধু আহমদী হওয়ার অপরাধেই তাদের বিরুদ্ধে এইরূপ আক্রমণ চালানো হয়।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, যে মুসলমানরা মৌলবি সাহেবানদের প্ররোচনায় আক্রমণ চালিয়েছে–তারা ইসলামের কোন্ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই

আক্রমণ চালিয়েছে? কুরআন তো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, 'ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই'। তারা কি এরূপ হীন আচরণ দ্বারা দুনিয়ার সামনে কুরআনের শিক্ষা ও নবী করীম (সা.)-এর আদর্শকে তুলে ধরতে চান? হযরত নবী করীম (সা.) কি এইরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর আক্রমণ করতে নাই? তিনি কি ইহাও বলেন নাই যে, নিরস্ত্রদের উপর আক্রমণ করো না? তারা কি তাদের আচরণ দ্বারা এই সব শিক্ষার অবমাননা করেন নাই?

বর্তমানে পাকিস্তান এক অতি সঙ্কটজনক অবস্থার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছে। এখন পাকিস্তানের নাগরিকদের মধ্যে সর্বপ্রকার ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলা দেশ-প্রেমিকদের অবশ্য কর্তব্য। যারা এই ঐক্যবোধের ভিতরে ফাটল ধরাতে চায় তারা কি দেশের শত্রুদের ক্রীড়নকের কাজ করছে না?

আমরা সরকারকে অনুরোধ করছি, এইরূপ অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে যদি দৃঢ়হস্তে প্রথম হতে দমন করা না হয় তা হলে এটা দেশের জন্য সমূহ অমঙ্গলের কারণ হবে।

অযৌক্তিক বল প্রয়োগ দ্বারা সত্যকে দমিয়ে রাখা কখনও সম্ভবপর হয় নাই। এই যুগেও হবে না।

....

এখন আহমদীদের কর্তব্য নিজেদের সকল গাফিলতি ত্যাগ করে দৃঢ়চিত্তে কাজ করে যাওয়া; এবং আল্লাহ্‌র নিকট অনবরত দোয়া করা, যেন তিনি সকল বিপদ আপদ দূর করে আহমদীয়াতের জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত করেন, আমীন।[৭]

চলতি দুনিয়ার চালচাল
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

গত ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহূত আহমদীগণের বার্ষিক জলসায় স্থানীয় কয়েক হাজার গয়ের আহমদী মুসলমান এক হীন আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে দু'জন আহমদী শাহাদৎ বরণ করেছেন। তা'ছাড়া অনেক শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক আহত হয়েছেন। তাদের কয়েক জনের আঘাত সাংঘাতিক রকমের। আহমদীদের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের দশ

সহস্রাধিক মূল্যের মালামাল লুট করে নেওয়া হয়।

এই আক্রমণে স্থানীয় মাওলানাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ছিল। ঐ দিনই এক সভাতে মাওলানারা গয়ের আহমদী জনসাধারণকে বুঝিয়েছেন যে, আহমদীদের কতল করতে পারলে বহুত ছওয়াব হবে, কারণ তারা কাফের।

এই আক্রমণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমরা শুধু জনসাধারণের বিবেকের সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা রাহমাতুল্লীল আলামীন এবং ইসলামকে বিশ্ব মানবের ধর্ম করে পাঠিয়েছেন। সব মুসলমানদের উপরেই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব ফরজ করা হয়েছে। এই প্রচারের কাজ চালাতে হলে আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামী আদর্শকে রূপায়িত করে দুনিয়ার সামনে নমুনা পেশ করতে হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া গয়ের আহমদী ভাইয়েরা উপরোক্ত আক্রমণ দ্বারা যে নমুনা পেশ করেছেন এটাকেই যদি বিধর্মীরা ইসলামী আদর্শ বলে ধরে নেন তবে জোর জবরদস্তিতেই ইসলাম প্রচার হয়েছে বলে যারা মত প্রকাশ করে থাকেন তাদের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে না কি?

আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে ইসলাম শক্তির আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেয়। এখানে এইরূপ অবস্থার লেশমাত্রও বিদ্যমান ছিল না। তবে নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ, লোকদেরকে আক্রমণ করাও তথাকথিত মাওলানাগণ ইসলামের শিক্ষার অন্তর্গত বলেই মনে করেন? তারা কি এই ভাবেই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান?

ঐ জলসায় কয়েকশত আহমদী ছিল যাদের মধ্যে অনেক শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাও ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পর্যন্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধের উপর আক্রমণ করতে যে নবী বারণ করেছেন তাঁরই উম্মত বলে পরিচয় দিয়ে যারা আহমদী নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের আক্রমণ করতে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিল তাদের দ্বারা হযরত নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষার মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে কি না সবাইকে ধীর স্থিরভাবে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলবেন সমাজের গুন্ডা শ্রেণির লোকদের দ্বারা এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু কথা হলো তারাও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত বলে দাবি করে

থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের পিছনে যারা প্ররোচনা যোগিয়েছিলেন তারা নায়েবে রসূলের দাবিদার। তা'ছাড়া সমাজে যদি ঐরূপ লোকেরই প্রাধান্য চলে, তারাই প্রশ্রয় পায় তবে ঐ সমাজকে অন্যেরা তাদের আচরণ দ্বারা বিচার করবে। যদি গুন্ডা শ্রেণির লোকেরাই ঐ জঘন্য কাজ করেছে বলে ধরে নেওয়া যায় তবে সমাজের বিভিন্ন স্তর হতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এইসব মুসলমান ভাইদের অধ:পতন দেখে সমাজে দুঃখের সীমা থাকে না। বস্তুত: তাদের এইরূপ অধ:পতনই যে বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহ্দীর (আ.)-এর আগমনের কারণ তাই আমরা গভীর ভাবে উপলব্ধি করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শাহাদতের বদলে তাদের মনের ও আচরণের পরিবর্তন আনুন, এই দোয়া করছি। আমীন।[৮]

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় শহীদের ঘটনার পর প্রথম কবিতা/নযম রচনা করেন আমাদের সন্তোষপুর জামা'তের আহমদী ভাই সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী সাহেব। সেই কবিতাটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল :–

রচি তারি গান

সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

ব্যথা-বেদনায়, আঁখি-জল-ধারায়
রচি তারি গান;
সত্যের তরে, যুগে যুগে যারা,
হইয়াছে শহীদান।
দ্বীনের কালিমা মুছে ফেলে ভূমে
জ্বালিবারে প্রদীপ আলো ;
যাদের শোণিতে ধুইয়া গিয়াছে
বিশ্বের যত পাপ তাপ কালো।

যাদের লহুর পরশে হইয়াছে সূচি
ভূবনের ধূলি কণা :
যাদের স্মৃতিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
ঝরে আজি শুধু অশ্রু কণা।
শোণিতের রঙ্গে লিখে গেল যাঁরা
রঙ্গিন করে ইতিহাস।
শত লাঞ্ছনা সহিয়াও যাঁদের
টলেনিকো বিশ্বাস।
কত ভাই বোন, দিল যখন প্রাণ
কত মা দিল বুক ছিড়ে;
তখনই এসেছে স্বর্গের ধারা
এ ধরণীর ধূলি তীরে।
কত রাজা মহারাজা এলো গেলো ভূমে,
কয় জনার নাম কেবা বলে ;
রাজার তাজ লুটায় কেন গো,
উমাইয়ার দাস, বিলালের পদতলে?
দুর্গম পথে চলিয়া যাহারা
দুর্জয় পথ করিল জয় ;
তাদেরি লাগি রচিলাম এই গাঁথা,
তাহারা মৃত্যুঞ্জয়।
হেরিতেছি আজও সেই ছবিখানি
মরু সাহারার তীরে ;
পাষানেতে বাঁধা আজও রহিয়াছে
ধূলি-কণা-রাশি ঘিরে।[৯]

দ্বিতীয় কবিতা/নযম রচনা করেন মৌলবি মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ্ সাহেব। পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত সেই কবিতাটি পরবর্তীতে তাঁর রচিত নাযমুল মাহ্দী গ্রন্থে প্রকাশিত হয় :–

শহীদী গজল

মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্

যুগে যুগে যাঁরা আল্লাহ্‌র রাহে
করিল জীবন দান
আকাশে বাতাসে মুখরিত হল
তাহাদের জয় গান।
বিংশ শতের তেষট্টি আজি
তেসরা নভেম্বর,
সাত চল্লিশা সালানা জলসা
ব্রাক্ষণবাড়িয়ার পর,
সন্ধ্যার পরে বক্তৃতা করে,
আহমদ তৌফিক ;
"ইমাম মাহ্দী আসিয়াছে ভবে,
দলীল প্রমাণে ঠিক।"
হেন কালে হায়! জাহিল লোকেরা
সভাতে পাথর ছুড়ে,
ইট্ পাট্‌কেল লাঠি সোটা ঢেল
মারে তারা জোরে জোরে।
ভাঙ্গা ইটের কঠিন আঘাতে,

কারো ফেটে যায় শির,
কারো হাতে পায়, কারো বুকে গায়,
সকলেই অস্থির।
মাহ্‌দীর দল, রাঙ্গা আবীর
মাখামাখি করে গায়,
জান্নাত হতে ডাকে ঘন ঘন
"শহীদেরা আয় আয়"।
স্বরগ ধামের শহীদী পিয়ালা
আকণ্ঠ করি পান,
"ওসমান গনি–আব্দুর রহিম"
হয়ে গেল কুরবান।
তাজা খুন, লালে রঞ্জিত আজি
শহীদের শির কাঁধ,
লহ লহ ওগো যুগল শহীদ
লহ 'মোবারকবাদ'।

****

লক্ষ তারকা লজ্জিত হল
নভঃ মন্ডলে হায়,
তাড়াতাড়ি তারা মেঘের আড়ালে
লুকাইল আপনায়।
উত্তরাকাশে, হেমন্ত রাতে
বৈশাখী সাজ সেজে,
ছুটিল তুফান, দাগিল কামান
ভীষণ গরজ তেজে।

বৃক্ষলতাদী লুটায় ভূমিতে,
শহীদের খুন হেরি,
কেয়ামত বুঝি হইবে এখন,
নাহি আর বেশি দেরী।
কম্পিত হল অন্তর ভূমি,
জালিম যাহারা ছিল,
দ্রুত পদে গিয়ে ঘরের ভিতরে
কষে খিল তারা দিল।
পুলিশ পাহারা, রাস্তায় খাড়া
হইল ততক্ষণে ;
রক্ত-হুলির, হল অবসান,
জানিল মু'মিনগণে।
বুকের রুধিতে, করিয়া গোসল,
শহীদী শরাব পিয়ে,
মাতাল কেহবা, অৰ্দ্ধ মাতাল,
চলে রাজপথ দিয়ে।
দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল
স্থানীয় হাসপাতাল,
যা ছিল বিছানা, রুগীতে আটে না
হয়ে গেল বে সামাল।[১০]

মামলা-মোকদ্দমা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণকারী নিরপরাধ লোকদের উপর বর্বর হামলায় নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনায় শান্তিপ্রিয় আহমদীরা সুবিচারের প্রত্যাশায় আইনের আশ্রয় নেয়। এই বর্বোরোচিত হামলার নেতৃত্বদানকারী মৌলবি তাজুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কান্দীপাড়ার গাজীউর রহমান, বিরাশার গ্রামের মৌলবি সমুজ আলী, মেড্ডার ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদসহ অনেককে আসামী করে থানায় ও কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার বাদী স্থানীয় মজলিসের কায়েদ ফরিদ আহমদসহ কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা উল্টা ২৩ জন আহমদীকে আসামী করে ঘটনার দিন রাতেই অর্থাৎ আহমদীদের মামলা করার পূর্বে থানায় এবং পরে কোর্টে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। আহমদীরা ভয়ে ঘটনার দিন রাতে ঘর থেকে বের হয় নি এবং থানায় যান নি। কেননা তখন থানা পুলিশ তাদের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল। তাদের মামলার নম্বর ছিল-পিএস কেস নং-৫ (১১)/ ৬৩, জি আর কেস নং ৭৯১/৬৩। তাদের মোকদ্দমায় আহমদী আসামীরা হলেন-

(১) মাওলানা ফারুক আহমদ, (২) মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, (৩) এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম, (৪) মৌলবি সলিম উল্লাহ্, (৫) ডা. আনোয়ার হোসেন, (৬) সায়েব আলী, (৭) সৈয়দ মোবাশ্বের আহমদ, (৮) সৈয়দ সালেহ আহমদ, (৯) ফরিদ আহমদ, (১০) জারু মিঞা, (১১) বশির আহমদ, (১২) সাদির খান, (১৩) মুমিন খান, (১৪) আজিজ খান, (১৫) আব্দুস সামাদ মিঞা, (১৬) আব্দুল আলিম, (১৭) ফখরুল ইসলাম, (১৮) মীর আব্দুর রাজ্জাক, (১৯) সোনা মিঞা, (২০) ইকবাল খান, (২১) আলী আহমদ লস্কর, (২২) আব্দুল আউয়াল এবং (২৩) আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

একবার বিরুদ্ধবাদীদের ক'জন আহমদীয়া জামা'তের প্রবীন সদস্য আব্দুল আউয়াল (মনু মিঞা) আনন্দবাজারস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আহমদীদেরকে মামলা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য হুমকি দেয়। তাদের দায়েরকৃত মামলার আর্জিতে উল্লেখ ছিল-কাদিয়ানীরা (আহমদীরা) জলসায় তাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে হযরত রসূল করীম (সা.)-কে অবমাননা করে বক্তব্য দেয়া হয় (নাউযুবিল্লাহ্)। এটা তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। তাই তারা বাধা দিতে গেলে আহমদীরা তাদের উপর আক্রমণ করে।

ফলে সংঘর্ষ হয়। এতে তাদের অনেকে আহত হয়। তখন স্থানীয় প্রশাসনের উপর বিরুদ্ধবাদীরা এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, আক্রমণের সময় থানায় খবর দিলেও পুলিশ আসে নি। এমনকি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের কোন অ-আহমদী উকিল আহমদীদের পক্ষে কাজ করতে সম্মত হয় নি। তাই কুমিল্লা থেকে সতীশ চন্দ্র দে নামে এক উকিলকে আনা হয়। তার সাথে ছিলেন আমাদের জামা'তের স্থানীয় উকিল গোলাম সামদানী খাদেম, ঢাকার ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান এবং সন্দ্বীপের জাহিদ হোসেন মোক্তার। এই জাহিদ হোসেন মোক্তার ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনাদের হাতে নিহত হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে উকিল ছিলেন রেহান উদ্দিন এবং হাকিম ছিলেন খাজা আব্দুল হালিম। তাদের দায়েরকৃত মামলায় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩ তারিখ গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়। ফলে আহমদীরা কোর্টে হাজির হয়ে জামিন লাভ করেন।

৩১ জুলাই ১৯৬৫ তারিখ মোকদ্দমা কুমিল্লা সেশন জজকোর্টে সোপর্দ করা হয়। কুমিল্লার এডিশনাল জজ চট্টগ্রামের মফিজুল হকের এজলাসে বিচারকার্য চলে। ১৩ জুন ১৯৬৬ তারিখ মামলা খারিজ হয়, যার ফলে তাদের নির্মম হত্যাকান্ডের তান্ডবলীলায় দু'জন নিরপরাধ মানুষ নিহত হলেও এর সুবিচার পাওয়া যায় নি। বরং বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাসিয়ে শাস্তি দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তবে দুনিয়াবী সুবিচার পাওয়া না গেলেও আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে এ কুরবানির পুরস্কার এবং বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি অনিবার্য। যা কেউ রুখতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَلِتُجۡزٰی کُلُّ نَفۡسٍۭ بِمَا کَسَبَتۡ وَہُمۡ لَا یُظۡلَمُوۡنَ ۝

অর্থাৎ, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হয়। আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না (সূরা আল্ জাসিয়াহ, ৪৫:২৩)।

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَہۡدِیۡ مَنۡ ہُوَ کٰذِبٌ کَفَّارٌ ۝

অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী (ও) অতি অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ্ কখনো হেদায়াত দেন না (সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৪)।

کَتَبَ اللّٰہُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ قَوِیٌّ عَزِیۡزٌ ۝

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা ফয়সালা করে নিয়েছেন, নিশ্চয় আমি এবং আমার

রসূলগণই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর (ও) মহাপরাক্রমশালী (সূরা আল্ মুজাদেলা, ৫৮:২২)। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন– তোমার প্রতি যে তীর চালানো হবে, সে তীর দিয়েই তার ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে (ইলহাম)।

বিভিন্ন ঈমানবর্ধক ঘটনা

গনি সাহেবের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ছিল রূহানিয়তের বাগানের মতো প্রস্ফুটিত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা পালনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামা'তের আদর্শবান তবলিগ সৈনিকের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, যা তাঁর জীবনে আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলমল ও অম্লান হয়ে আছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করা হল :–

১। সুন্দরবন জামা'তের ধর্মের এক উত্তম সেবক ছিলেন শামসুর রহমান টি কে সাহেব। তিনি ১৯৬১ সালে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় যোগদান করত: আল্লাহ্ তা'লার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হাতে বয়আত করেন। অত:পর নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে এসে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আবির্ভূত হওয়ার সংবাদ অকপটে প্রচার করতে থাকেন। ফলে যতীন্দ্রনগর গ্রামের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আহমদীয়া জামা'তের প্রতি আকৃষ্ট হন। শামসুর রহমান সাহেব ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৪৩তম সালানা জলসায় এ জেরে তবলিগ বন্ধুদেরকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। তাঁরা ঐশী জামা'তের মিলন মেলার জলসায় রূহানিয়তের সৌরভ অনুভব করে বয়আত নেন এবং যতীন্দ্রনগর ফিরে গিয়ে আহমদীয়াতের সত্যতার প্রচার করতে থাকেন। ফলে আহমদীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এতে একদল বিরুদ্ধবাদী মৌলবি ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রচন্ড মোখালেফাত করতে থাকে। কিছু সংখ্যক মৌলবি আহমদীদের সাথে বহাস করতে সম্মত হন। ফলে জামাতের নবদীক্ষিত সদস্য সুন্দরবন স্কুলের শিক্ষক জোনাব আলী মাষ্টার ঢাকায় দারুত তবলিগে ছুটে আসেন। তৎকালীন প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের নিকট আরজ করেন– 'আমীর সাহেব আমরা মোখালেফাতের সম্মুখীন হয়েছি। এলাকার মৌলবিদের সাথে বহাস করতে হবে। কিন্তু আমাদের কোন মাওলানা নেই। একজন মাওলানা দেন'। তখন

সুন্দরবন প্রেরণের জন্য উপস্থিত কোন মাওলানা দারুত তবলিগে ছিলেন না। আমীর সাহেব ভাবতে লাগলেন। পাশে দাঁড়ানো ছিলেন খোদার রাহে ফানাফিল্লাহ্ তবলিগ পাগল যুবক ওসমান গনি। তিনি অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমীর সাহেবকে বলেন–'আমীর সাহেব আমাকে অনুমতি দেন, আমি যাবো। মৌলবিদের সাথে আমি বহাস করবো'। তখন আমীর সাহেব বলেন–'তুমি তো ধর্মীয় জ্ঞানে কোন আলেম নও। তুমি কীভাবে তাদের সাথে বহাস করবে? পবিত্র কুরআন হাদিসের আলোকে যুক্তিতর্কে তাদেরকে পরাভূত করতে না পারলে সমস্যা হবে'। তখন দুঃসাহসী যুবক ওসমান গনি বলেন–'আমি আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের রচিত হাদীসুল মাহ্দী গ্রন্থটি পাঠ করেছি। এটি নিয়ে যাবো। এ গ্রন্থের আলোকে বহাস করবো। বিরুদ্ধবাদীদের এর বাইরে আপত্তি তোলার কোন প্রশ্ন নেই'। অত:পর আমীর সাহেব তাঁকে সেখানে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখন যাতায়াতের জন্য তাঁর হাতে অর্থকড়ি ছিল না। এছাড়া তিনি জামা'তের কাজে জামা'ত থেকে অর্থ নেওয়া অপছন্দ করতেন। তাই এক বন্ধুর নিকট থেকে টাকা ঋণ নিয়ে জোনাব আলী মাষ্টারের সাথে সুন্দরবন চলে গেলেন। এটা ১৯৬২ সালের শেষ কিংবা ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকের ঘটনা।

তখন সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত ক্ষিপ্তমান বিরুদ্ধবাদী মৌলবিদের সাথে জামা'তে আহমদীয়ার বহাস হয়। মাদ্রাসা থেকে পাশ করা বড় বড় ডিগ্রিধারী আলেমদের মোকাবেলায় তর্কযুদ্ধে জড়িত হন ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে ডিগ্রিবিহীন যুবক ওসমান গনি। দেখতে দাড়ীবিহীন এবং পোশাক-পরিচ্ছদে আধুনিক যুবক। কিন্তু ধর্মীয় আলোচনার বাকযুদ্ধে গর্জে উঠেছেন সিংহের মতো। জামা'তে আহমদীয়ার উপর যত আপত্তি উত্থাপন করা হয় তা তিনি হাদীসুল মাহ্দীর আলোকে কুরআন, হাদিস ও সুলতানুল কলমের ব্যাখ্যায় অকাট্য যুক্তির দ্বারা খন্ডন করেন।

ফলে বিরুদ্ধবাদীরা পরাভূত হয়। তারা স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও জামা'তের প্রেসিডেন্ট শামসুর রহমান সাহেবের ব্যক্তিগত প্রভাবে তাদের প্রথাগত শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে পারে নি। যতীন্দ্রনগর এলাকায় আহমদীয়াতের প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়– সুবাতাস বহে। গ্রামের মাত্র কয়েকটি পরিবার ছাড়া বাকীরা আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। গ্রামের একমাত্র মসজিদটি আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

তখন গনি সাহেব পনের দিন সুন্দরবন অবস্থান করে শামসুর রহমান সাহেবের সাথে দিবারাত তবলিগ করেছেন। হাসিমুখে সালাম বিনিময়ে বিনয়ের সাথে কথা বলা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে মানুষ সহজে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর তবলিগের রণকৌশলের একনিষ্ঠ দক্ষতায় বয়আত করে অনেকে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। আজকের বৃহৎ সুন্দরবন জামাতের গোড়াপত্তনে ওসমান গনির অবদান অনস্বীকার্য।

২। ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসায় সুন্দরবন জামা'তের নবদীক্ষিত অনেক আহমদী জেরে তবলীগি বন্ধুসহ যোগদান করেন। তাঁরা গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের সাধারণ মানুষ। পোশাক-পরিচ্ছদে কোন আড়ম্বরতা নেই। কিন্তু তাঁরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমান। তাঁর ঐশী জামা'তের মিলন মেলার অতিথি। এটাই ছিল জামা'তের উত্তম খাদেম ওসমান গনির নিকট বড় পরিচয়। তাদের অনেকে তাঁর তবলিগে বয়আত করেছেন। তাই তিনি এ সম্মানিত অতিথিদের সেবাব্রতে বিভিন্নমুখী কাজ করেন। কুয়া থেকে পানি তোলে নিজ হাতে তাদের ময়লা জামা-কাপড় ধুয়ে দেন। তাদের ময়লা সেন্ডেল ও জুতা পরিস্কার করে দিতেও তিনি লজ্জাবোধ করেন নি। বরং সেবা প্রদানে গর্ববোধ করেন। একজন শিক্ষিত শহরের মানুষের এ ধরনের মানব সেবা দেখে সে দিন সকলেই বিস্মিত হন। জেরে তবলিগ বন্ধুগণ জামা'তে আহমদীয়ার আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত দেখে বয়আত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) 'আপনার সন্ধানে আছি' শিরোনামের বাণীতে জামা'তের খেদমতের জন্য যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খাদেমের সন্ধান করেন, যেমন–মহল্লার গলি ঝাড়ু দেয়া, বোঝা বহন করে সারা দিনরাত ঘুরে বেড়ানো, সারা দিনরাত জেগে পরিশ্রম করা, অকপটে সত্যকথা বলা এবং সত্যের তরে জীবন কুরবানি করে দেয়া প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন ওসমান গনি।

৩। একবার এক আহমদী তাঁর এক ছোট ছেলেসহ গ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। রাতে বকশীবাজার দারুত তবলিগের মসজিদে ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ছেলেটি রাতে ঘুমেরঘোরে প্রস্রাব করে দেয়। ফলে পিতা তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে মারমুখী হয়ে উঠেন। লজ্জায় পরে যান। কেননা একটু পরই মুসল্লিরা ফজরের নামাযের জন্য আসবেন। ওসমান গনি তা দেখে পিতাকে বারণ করেন, বলেন–'অবুঝ ছেলে, তাকে মারবেন না-মারবেন না। আমি মসজিদ

পরিস্কার করছি'। তৎক্ষণাৎ তিনি কুয়া থেকে পানি তুলে নিজেই মসজিদ পরিস্কার করে ফজরের নামাযের ব্যবস্থা করেন।

বলাবাহুল্য, চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে আরব দেশে এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করা শুরু করলে এক সাহাবি তাকে মারতে উদ্যত হন। মানব প্রেমিক মহানবী (সা.) তা প্রত্যক্ষ করে তাকে মারতে বারণ করেন। বলেন– 'তাকে মেরো না, মেরো না। প্রস্রাবের ব্যাঘাত হলে তার ক্ষতি হবে। পরে মসজিদ ধুয়ে ফেললে চলবে'। আদর্শ মানব (সা.)-এর মানবতার প্রতি এমন দৃষ্টান্তের অনুকরণেই সেদিন ওসমান গনি মসজিদ পরিস্কার করেন।

৪। সে সময় দারুত তবলিগে কাঁচা পায়খানা ছিল। তা-ও জলসার সময় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই কাঁচা পায়খানায় ময়লা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত। মানবসেবার উৎকৃষ্ট খাদেম তা দেখে নিজেই ময়লা পরিস্কার করে জলসায় যোগদানকারী অতিথিদের পরিচ্ছন্নতা প্রদান করেছেন। এমন মানব দরদী মানুষের দৃষ্টান্ত পাওয়া বার!

৫। একবার এক আহমদী ব্যক্তি দারুত তবলিগে মসজিদে রাতে ঘুমায়। মাথার নিচে জায়নামায মুড়ে ঘুমাচ্ছিলেন। এটা দেখে মানুষের দুঃখকষ্টে ব্যথিত মানুষ ওসমান গনি নিজের বালিশ দিয়ে দেন। নিজে বালিশ ছাড়া রাত কাটান। হযরত উমর (রা.)-এর সময় এক যুদ্ধে আহত সাহাবিরা মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করা অবস্থায় তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য পানি নিয়ে গেলে তাঁরা নিজে পান না করে একে অপরের সহমর্মিতায় আহত ভাইকে দানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওসমান গনি সেই দিন সে আদর্শের অনুপ্রেরণায় নিজের সুখ বিসর্জনে অপর ভাইয়ের সুখের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৬। ১৯৩৫ সালে ২৯ নভেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক জুমু'আর খুতবায় বলেন–'আমি এমন ব্যক্তি চাই যে নিজে পাগল এবং অপরকে পাগল করে তোলে'। আমাদের গনি সাহেব আহমদীয়া জামা'তের কাজে এমনই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তবলিগে মানুষকে পাগল করে তুলতেন। পবিত্র কুরআন, হাদিস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সুলতানুল কলমের জ্ঞানে তিনি একজন আলেম না হলেও তবলীগের কাজে তিনি পারদর্শী ছিলেন। হাস্যোজ্জ্বল নুরানী চেহারার মানুষটি বিভিন্ন জনের সাথে সালাম বিনিময়ে অতি আপন হয়ে যেতেন এবং মানুষের সাথে কথোপকথনে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা ব্যক্ত

করতেন। আলোচনায় কখন ঘন্টার পর ঘন্টা সময় চলে যেতো তা তাঁর খেয়াল থাকতো না।

দূর-দূরান্তের কোন লোকের সাথে পরিচয় হলে পরবর্তীতে তাঁর সাথে পত্রালাপের সেতু বন্ধন গড়ে তুলতেন। জামা'তের বইপুস্তক প্রেরণ করতেন। তাঁর আবেগাপ্লুত তবলীগি পত্রে ঐশীবাণীর প্রাণবন্ত ব্যাখ্যা পরিস্ফুটিত হত। শহীদের মুকুট লাভের তিন মাস পূর্বে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দূর্গারামপুর গ্রামের আবু মোহাম্মদ খানকে এমনই একটি তবলীগি পত্র লিখেছিলেন :–

দোয়াবর : পিয়ারে ভাই–

আবু মোহাম্মদ খান সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সালামবাদ সমাচার এই যে, খোদার ফজলে আপনার ৪/৮/১৯৬৩ খ্রিঃ তারিখের লেখা পোষ্ট কার্ডখানা রি-ডাইরেক্ট হয়ে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। অদ্যই আপনার এই পত্রটি পেয়েছি। যা-হউক পত্রখানা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি যে, আপনি খোদা তা'লার মেহেরবাণীতে পাশ করেছেন।

পিয়ারে ভাই–আপনার পত্রখানা গভীর মনযোগের সাথে পাঠ করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমি শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাড়িতেই অবস্থান করছি। আপনার লেখা সম্বন্ধে অবশ্যই উপস্থিতিতে আলোচনা করে যা সমচীন তা-ই করবো। আমার অনুপস্থিতিতে আপনি আমাদের ঢাকা লোকাল মজলিসের কায়েদ শহীদুর রহমান সাহেবের সাথে আলাপ করে অবশ্যই এর একটা সমাধান করবেন। আশা করি খোদা চাহেত পানাউল্লাহ্ সাহেবের সাথে ঢাকা এসে আপনি ভূত-ভবিষ্যতের সংস্থাপন করে নিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আপনার জীবনের গতিপথের একটা বিধি-ব্যবস্থা করে দিবেন। যা আপনাকে সত্যের দিকে সুদৃঢ় করে দিবে। আমি অবশ্যই আগামী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ঢাকা থাকার ইচ্ছা করি। সম্ভবত উক্ত সময়ে আপনি ঢাকায় আসলে সব বিষয়ে একটা সমাধান করা যাবে।

সত্যই ভাই আবু! সে কি আপনার মনের আবেগের সাড়া। আল্লাহ্ তা'লার মহীমায় আপনিও আমাদের মত কি সোহার্দপূর্ণ জীবন গড়ে তুলবেন? যা হযরত রসূল করীম (সা.) এর মারফত বিশ্বের মুসলিম মানব সমাজ পেয়েছিল।

হায়! আজ কোথায় সেই হযরত বেলাল (রা.), কেমনে দেখাবো বেনজীর

আদর্শের খলীফার গুরু ভক্তি হযরত আলী (রা.)কে। চমকে উঠতে হয় হযরত আবু বকর (রা.)-এর অটল ধৈর্যের আদর্শ শুনে। সারা আরব যেদিন গ্রাস করতে চেয়েছিল মুসলমানকে তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে মুষ্টিমেয় এবং সর্বস্বহারা গুটিকতক নবীন মুসলিম। ঘাত-প্রতিঘাত তাদেরকে দিতে লাগল নতুন উদ্দীপনা ও সত্যের অনুসন্ধান।

কিন্তু তাদের বসার ছিল না স্থান। ক্ষুদ্রকুটিরে ছিল না খেজুর পাতার পূর্ণ তৈরী ছাদ। তার মধ্যে রজনীতে প্রবেশ করত চাঁদের আলো এবং দুপুরে ভীষণ রৌদ্রের তাপ সে কি বিচিত্র! এরই মধ্যে বসে তারা চিন্তা করত সারা বিশ্বে প্রচারকারী মহান স্রষ্টার বিধি।

আমি কে? তা জানি না, বুঝি না, আমাকে কি করতে হবে। সে আলো, সে নূর, আসতেছে সারা জগতের গগন জুড়ে। কে তা দেখে? কে তা লুটে নেয় আপনজনের তরে? ধন্য হবে বিনয়ী ধর্মের মূর্তি। সুবাহানাল্লাহ্!

পরীক্ষায় আল্লাহ্ তা'লা ফলদাতা। তিনি অগণিত ও অযাচিত দানের মালিক। দোয়া গো। আজি সব যে তোমার কাছে মাগি। সবই কর গো খোদা যা তোমার কাছে সপি।

তাং ধুল্ল্যা

১০/৮/১৯৬৩ খ্রিঃ

ইতি

মোহাম্মদ ওসমান গনি[১১]

৭। গনি সাহেব পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আঞ্চলিক কায়েদ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মুসলেহ্ উদ্দিন খাদেম সাহেবের সাথে এদেশের অনেক মজলিস সফর করেন। খোদ্দামকে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। তিনি যেখানে গিয়েছেন সেখানেই সকলের সাথে মিশে গেছেন। তাঁর মাঝে কোন আত্ম অহমিকা ছিল না। নীরব কাজের মাঝে তিনি সকলের দৃষ্টি নন্দিত ছিলেন।

ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জামা'তে অনুষ্ঠিত জলসা, তবলীগি অনুষ্ঠান এবং তালিম তরবিয়তী কিংবা খোদ্দামের ইজতেমার কর্মসূচিকে সার্থক ও সফল করে গড়ে তোলতে তিনি অন্যান্যদের সাথে প্রাণের আবেগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে দিনরাত পরিশ্রম করেন। কখনও নিজেকে মেহমান হিসেবে নয় সর্বদা খাদেম

হিসেবে পেশ করেছেন।

৮। কোন জামা'তে মোখালেফাত সৃষ্টি হলে কিংবা কোন আহমদী ভ্রাতার কোন সমস্যা হলে দুর্বার বেগে ছুটে গেছেন তিনি। কখনও জামা'তের অন্যান্যদের সাথে, কখনও একাই গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছেন।

তাই দেখা যায়, ১৯৬৩ সালে দূর্গারামপুর জামাতে মোখালেফাত সৃষ্টি হলে তিনি মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরীর সাথে সেখানে চলে যান। তখন জামা'তের সদস্যদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়া, হাটে বাজারে যাওয়া, জমিতে চাষাবাদ করা এবং মসজিদ সংস্কারসহ প্রতিক্ষেত্রে প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি হয়। উদ্বদ্ধ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে ফৌজদারী মামলা করা হয়। অতঃপর বিরুদ্ধবাদীরা আপোষ-মীমাংসায় আসে, পরিস্থিতি শান্ত হয়।

তখন দিনরাত মাটি কেটে তাড়াতাড়ি নতুন টিনের ঘর তৈরী করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আর এ কাজে স্থানীয় আহমদীদের সাথে নিরলস পরিশ্রম করেন ওসমান গনি। তিনি নিজে মসজিদ নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মোখালেফাতের সময় সতীর্থদের সাথে সহমর্মিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অভয়বাণী শুনান। তাই দূর্গারামপুর জামা'তের আহমদীরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আজকের দূর্গারামপুর জামা'তের যে মসজিদ বিদ্যমান এর বর্ধিত সংস্কারের গোড়াপত্তনে গনি সাহেবের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

৯। গনি সাহেব পরদুঃখে খুবই কাতর ছিলেন। একবার ময়মনসিংহের এক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র আই.এস.সি. পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পেরে সাহায্যের জন্য ঢাকায় আসেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তার ফি জোগাড় না হলে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। নানা জনের কাছে হাত পেতেও যখন পরীক্ষার ফি-এর জোগাড় করতে পারলো না তখন গনি সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ছেলেটির অবস্থা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়। তাঁর নিজের খাওয়া খরচের জন্য যা ছিল তা প্রথমে ছেলেটিকে প্রদান করেন এবং বাকী টাকা অন্যদের নিকট হতে কর্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি সেই ছেলের ভবিষ্যৎ তথা সমাজের উদীয়মান এক যুবককে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করেন।

১০। একবার আখাউড়ার খড়মপুরে উরুস উপলক্ষে জামা'ত থেকে সপ্তাহব্যাপী তবলিগের আয়োজন করা হয়। গনি সাহেব তখন নিজের

জীবিকার অন্বেষণের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু তবলিগের নাম শুনেই তিনি পাগল হয়ে যান এবং সর্বাগ্রে তবলিগে খাসের মুজাহিদ হিসেবে তাঁর নাম লেখান। তিনি নিজের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে খাঁটি ইসলাম তথা আহমদীয়াতের পয়গাম প্রচার করতে খড়মপুর চলে যান এবং সপ্তাহব্যাপী সেখানে তবলিগের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন।

১১। গনি সাহেবের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন নাজির আহমদ ভূঞা সাহেব। ১৯৫৭ সালে ভূঞা সাহেবের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে চাকুরি হয়। পদায়ন হন বরিশাল শহরে। এতে গনি সাহেব অত্যন্ত খুশি হন। ভাবেন, বন্ধু বরিশাল চলে যাবেন, তার সেবায় কিছু করা দরকার। তখন ভূঞা সাহেবের নতুন বিছানার চাদর ও মশারীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভূঞা সাহেবের তখন ক্রয় করার মত অর্থ ও সময় ছিল না। তাই গনি সাহেব সদরঘাট গিয়ে বিছানার চাদর ও মশারী ক্রয় করে নিয়ে আসেন এবং বরিশাল যাবার সময় উপহার দেন। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আন্তরিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এতে নাজির আহমদ ভূঞা সাহেব অভিভূত হন এবং অর্ধশতাব্দী পরও তিনি গনি সাহেবের সেই স্মৃতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

১২। তাঁর বিয়ের বয়স হওয়ার পর অভিভাবকরা তাঁকে বিয়ের জন্য বারবার তাগিদ দিতে থাকেন। একবার এক নিকট আত্মীয়ের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ের আলাপ হয়। কিন্তু তিনি অ-আহমদী মেয়ে বিয়ে করতে অসম্মতি জানান। এ ব্যাপারে বহু দিন অভিভাবকদের থেকে দূরে থাকেন। তখন তাঁর ছোট ভাই আওলাদ হোসেন তাঁর কর্মস্থল করাচী থেকে বিয়ের জন্য বড় ভাইকে অনুরোধ করেন। তিনি এক পত্রে লিখেন– 'ভাই জান! আপনি আহমদী জামা'তে বিয়ে করুন। আপনার বিয়ের যাবতীয় খরচ আমি দিবো'। উত্তরে গনি সাহেব লিখেন–'বিয়ের আগে বাড়িতে নতুন ঘর নির্মাণ প্রয়োজন'। প্রতি উত্তরে তিনি লিখেন–'ঘর নির্মাণ করতে কত টাকা লাগবে তা আমাকে জানান, আমি শীঘ্র টাকা পাঠাবো'। অতঃপর গনি সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইজতেমা ও জলসার পর ঘর নির্মাণ করে বিয়ে করার প্রস্তুতি নেন। তখন বিয়ে ঠিক হয়েছিল জামা'তের এক সদর মুরব্বীর মেয়ের সাথে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বিয়ের পূর্বেই তাঁকে শহীদের বর বেশে জান্নাতের নতুন ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভাগ্যে উত্তম বর ও ঘর লাভের সৌভাগ্য হয়।

১৩। জনাব শহীদুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন– ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর

মাসের শেষের দিকে রাবওয়ায় সালানা জলসা উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে আগত সত্যান্বেষীদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। খাকসারের সেই বছর জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য হয়ে ছিল। সে সময় গনি সাহেবের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একজন বাঙালি আহমদী পেয়ে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পান। রাবওয়ায় যে ক'দিন ছিলাম, গনি সাহেবের সহবতে থাকার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর সেই স্মৃতিগুলি আমার হৃদয়ে চির জাগরুক হয়ে আছে। হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ যখন আসে তখন তিনি খুশীতে ভরপুর। আমরা পাঁচ জন বাঙালি, মাওলানা মমতাজ আহমদ সাহেব, গনি সাহেব, সারগোধা পাকিস্তান মিলিটারী পাবলিক স্কুলে অধ্যয়নরত ২ জন ছাত্র (যার মধ্যে মে. জে. আমজাদ আহমদ খান চৌধুরী ছিলেন– লেখক) এবং খাকসার প্রিয় নেতার সাথে মোলাকাত করি। হযরত সাহেবের নিকট বাংলার জামা'তের উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন জানাই। বাংলার জামা'তের প্রতি হুযূরের অনেক আন্তরিক মহব্বতের পরিচয় পাই। জলসা থেকে আসার সময় গনি সাহেব যে বিদায় সম্ভাষণ জানান এটা গভীর ভালোবাসারই পরিচয় বহন করে। তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বাংলার জমা'তের উন্নতি কিভাবে করা যায় তা চিন্তা করা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে জামা'তের খেদমতে কাজ করে যাওয়া।' পরে খাকসার পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সাথে জামা'তের কাজ করেছি।[১২]

১৪। জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী বলেন– ১৯৬৩ সালে শহীদ ওসমান গনি আমাদের দূর্গারামপুরে এসেছিলেন। তখন আমি ৯/১০ বছরের বালক। তাঁকে আমি চাচা ডাকতাম। তিনি গ্রামবাসীকে অনেক স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে তবলিগ করেছেন। পাশে মেঘনা নদীতে গোসল করেছেন। চমৎকার ভঙ্গিতে কথা বলতেন। আমাদের গ্রামের মসজিদ নির্মাণে কায়মনে শ্রম দিয়ে কাজ করেছেন। সেকালে আমি একবার আব্বার সাথে ঢাকায় জলসায় আসি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জলসার কাজে মহা ব্যস্ত। তাঁর পায়ের চপ্পল দু'টি পা হতে অনেক বড় ছিল। আমি এ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে বলেন– 'আমার এই চপ্পল কেউ পছন্দ করে না এবং পরেও না।' তার সেদিনের হাসিমাখা মুখ ও কথা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনির নিজ হাতে লেখা একটি পত্র নিম্নে প্রদত্ত হল :–

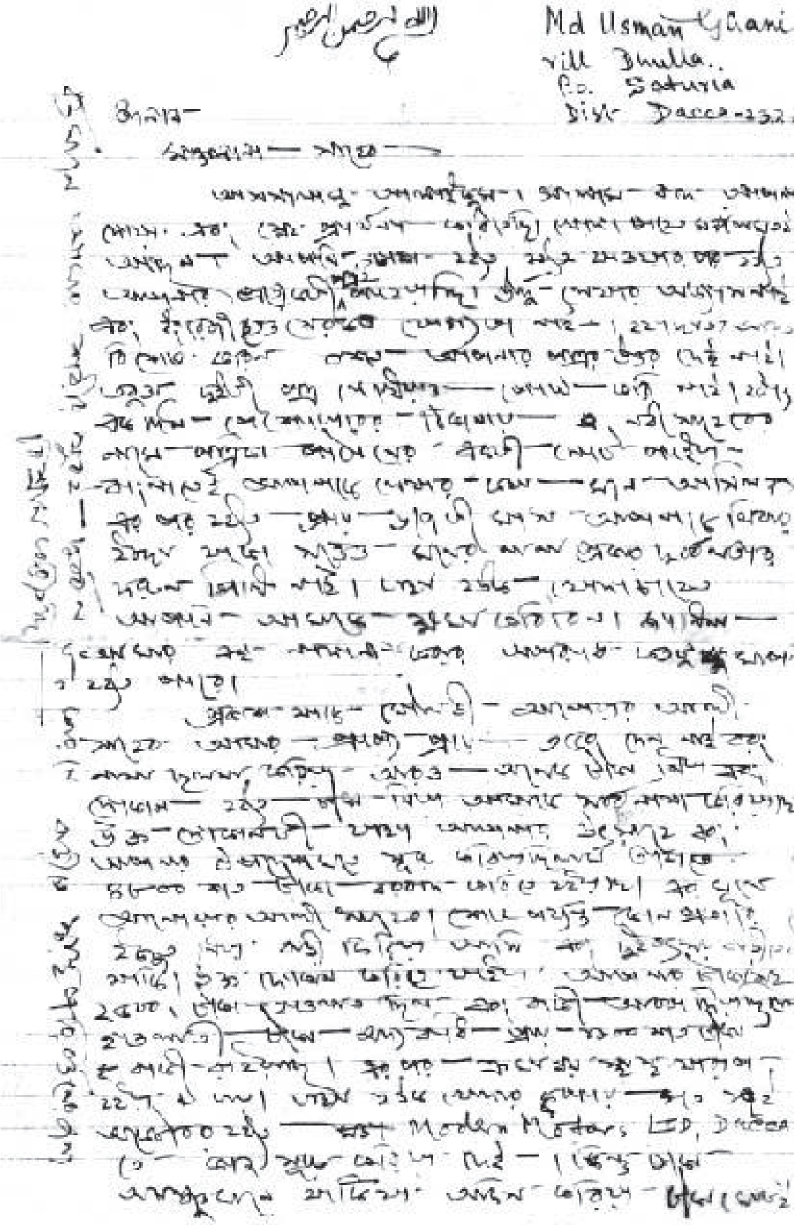

Md Usman Gani
vill Bhulla..
P.O. Saturia
Dist Dacca-232

Modern Motors LTD, Dacca

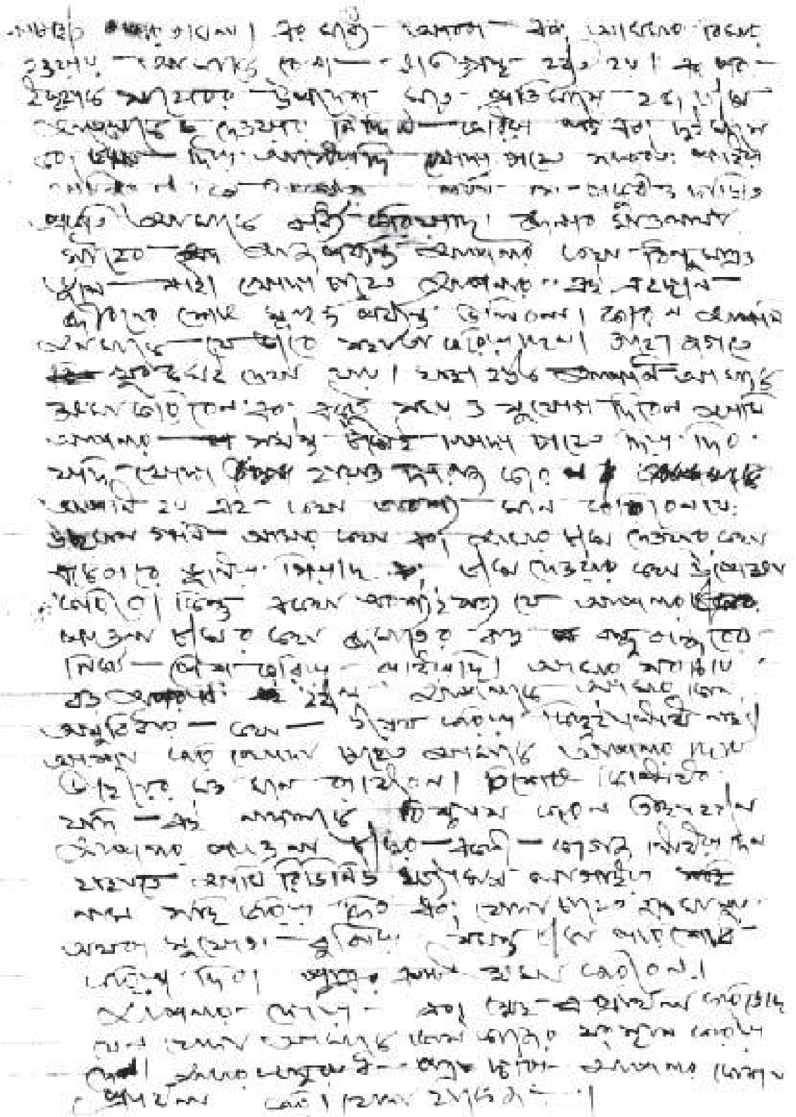

স্বজনদের স্মৃতিকথা

মোহাম্মদ ওসমান গনি অর্ধশত বছর আগে শহীদের মুকুট লাভ করেছেন। এত বছর পর তিনি কেমন মানুষ ছিলেন এবং মানুষের জন্য কি করেছেন, তা অনুসন্ধানে এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আমরা ক'জন ২৬ মে ২০১২ তারিখ মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার ধুল্যা গ্রামে যাই। ওসমান গনির জীবনালেখ্যের ওপর প্রমাণ্য চিত্রের ডকুমেন্টারী তৈরী করা হয়।

শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনির জন্মস্থান। ছবিতে (১) লেখক, (২) অধ্যক্ষ জাফর আহমদ, (৩) এস. এম. সুমন আহমদ এবং (৪) মোহাম্মদ ওমর আলী (ছবি-২০১২)।

তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন স্মৃতি-তর্পণে আবেগাপ্লুত হয়ে যান। সকলেই একবাক্যে বলেন–এমন ভালো মানুষ আমরা কখনো দেখি নি। নিম্নে তাঁর স্বজনদের ক'জনের স্মৃতিকথা উল্লেখ করা হলো :–

১। শহীদ ওসমান গনির ছোটবোন সুফিয়া বেগম সাহেবা বলেন–

আমার বড় ভাই শহীদ ওসমান গনি। তিনি বাল্যকাল থেকেই পরোপকারী ছিলেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের সেবা করেছেন। পাড়া-প্রতিবেশীসহ

গ্রামের সকলের আপনজন ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ইজতেমা ও জলসায় যাবার সময় আমি তাঁকে রুটি ও হালুয়া তৈরী করে দেই। তখন জিজ্ঞাসা করি আপনি কবে আসবেন। তিনি আমাকে আদর করে বলেন– 'আগামী মঙ্গলবার চলে আসবো' (ইন্‌শাআল্লাহ্)।

কিন্তু সোমবারই তিনি শহীদ হন। আমাদের বাড়িতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একটি এবং ঢাকা থেকে একটি টেলিগ্রামে মৃত্যুর সংবাদটি পৌঁছে। তখন আমার পিতামাতাসহ বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে। কিন্তু সেই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার কোন সুবিধা ছিল না বিদায় ভাইজানের মরদেহ দেখা সম্ভব হয় নি। পরে আমরা সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে তাঁর কবর দেখি এবং যিয়ারত করি। আমি খুবই গর্বিত আমার বড় ভাই প্রথম বাঙালি শহীদ। আর আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১৯৬৪ সালে বিবাহ হয়। জামা'তের বিভিন্ন জনের কাছে আমি শহীদ ওসমান গনির বোন হিসেবে পরিচিত।

শহীদ ভাইজান আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি বাড়িতে পাক্ষিক আহমদী নিয়ে আসতেন এবং আমাকে পড়তে দিতেন। আমাকে বাংলা নযম শিক্ষা দেন। তিনি শহীদ হওয়ার পর আমার পিতামাতা এবং আমার বড় বোন বয়আত করে আহমদী হন। আমার মা বয়আত নিয়েছিলেন মাওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, সদর মুরব্বীর হাতে এবং আমার বড় বোন ময়মনসিংহ গিয়ে আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের হাতে বয়আত নেন। মৌলবি ছলিম উল্লাহ সাহেবের রচিত 'শহীদী গজল' নযমটি আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পাঠ করি। এখনও এ নযমটি পাঠ করলে আমার চোখে পানি আসে। আল্লাহ্ তা'লা আমার ভাইকে শহীদের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

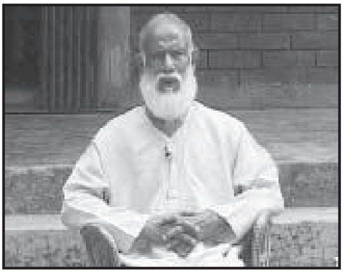

২। শহীদ ওসমান গনির চাচাতো ভাই জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম বলেন–

শহীদ ওসমান গনি বয়সে আমার কয়েক বছরের বড় ছিলেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। বাড়িতে সকল ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়ার জন্য

তাগিদ দিতেন। আর্মিতে চাকুরি করা কালে বাড়ি আসলে পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকি গ্রামবাসীরা কে কেমন আছে, ছেলে-মেয়েরা কে কি করে, কারও লেখাপড়ার অসুবিধা আছে কি না খোঁজ নিতেন। তাঁর শহীদ হওয়ার পর সকলের মনে একটি প্রশ্ন জাগে হায়! এমন ভালো মানুষটিকে কেন মারা হল?

তিনি একজন উত্তম সমাজ সেবক ছিলেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে আমাদের গ্রামের কয়েকজনকে আর্মিতে চাকুরির ব্যবস্থা করেন। কোন বয়স্ক লোক রাস্তায় বোঝা বহনের সময় অসুবিধা হলে তিনি নিজের মাথায় নিয়ে বোঝা বহন করে দিতেন। কোন মহিলার ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে হাটতে অসুবিধা হচ্ছে দেখতে পেলে নিজে কোলে নিয়ে পৌঁছে দিতেন। কখনো এ কাজের জন্য আমাদেরকে বলতেন। আমরা তাঁর স্নেহাদেশ পালন করতাম।

তিনি আহমদী হওয়াতে অনেকে তার প্রতি বিরূপ ধারনা পোষণ করলেও তাঁর আচার ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। সবাই একবাক্যে বলতেন তিনি একজন আদর্শবান সৎ মানুষ। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে গ্রামে কিছু করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু করা হয় নি। যদি করা হত আমাদের বংশধররা তাঁকে জানতে পারতো।

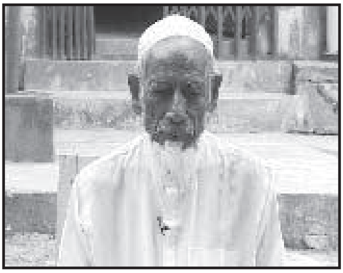

৩। শহীদ ওসমান গনির চাচাতো ভাই জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন–

গনি ভাই আমার তিন / চার বছরের বড় ছিলেন। আমাকে তিনি সর্বদা লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ যোগাতেন। তিনি স্কুলে যাবার সময় আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তাঁর সাথে বিকেলে খেলাধূলা করতাম। তাঁর স্বভাব চরিত্র উত্তম ছিল। পানিতে যেমন কোন দোষ নেই, তেমনি তাঁর মাঝে কোন দোষত্রুটি ছিল না। এলাকায় তাঁর কোন শত্রু ছিল না। তবে আহমদী হবার কারণে মাওলানাদের ফতোয়ায় বিভিন্ন জন কিছুটা বৈরীতা করেছে। কিন্তু তিনি এটা হাসি মুখে বরণ করে নেন।

৪। শহীদ ওসমান গনির ভাতিজা জনাব মোহাম্মদ বদর উদ্দিন বলেন–

গনি সাহেব আমার শ্রদ্ধাভাজন চাচা ছিলেন। তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নারায়ণগঞ্জে একটি মুদীর দোকান দিয়েছিলেন। সেই দোকানে আমাকে নিয়ে যান। আমি দোকানে ছয় মাসের মত কাজ করি। পরে বাড়ি চলে আসি। কিছুদিন পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জলসায় যান। তাঁর মতো পরোপকারী মানুষ কোন দিন দেখি নি। তিনি নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করেছেন।

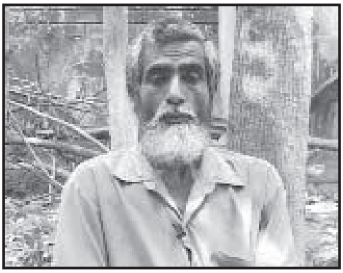

৫। শহীদ ওসমান গনির ভাতিজা জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বলেন–

আমার চাচা শহীদ হওয়ার সময় আমি দশ বছরের বালক। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমাকে বাল্য শিক্ষা বই পড়াতেন। গ্রামের মুরব্বীদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর জন্য পরামর্শ দিতেন। কোন ছেলের লেখাপড়ার অসুবিধা দেখলে নিজেই বই খাতা কিনে দিতেন। কেউ পড়া ফাঁকি দিলে তাকে কড়া শাসন করতেন। আমি লেখাপড়ার জন্য তাঁর হাতে মার খেয়েছি। তিনি আমাকে একটি স্লেট-পেনসিল কিনে দিয়ে ছিলেন। এটা আমি তাঁর স্মৃতিস্বরূপ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করি। কিন্তু ১৯৮৮ সালে বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি যখন আমাদের বাড়িতে পৌঁছে তখন সারা গ্রাম জুড়ে যেন কিয়ামত নেমে আসে। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই ভারাক্রান্ত ও শোকাহত

হয়ে পড়ে। সেদিন মনে হয় ধুল্যা গ্রামের পশু-পাখি এবং গাছ-পালাও শোকাভিভূত হয়েছিল। আমি আমার ষাট বছর বয়সে অনেক স্থানে গিয়েছি, অনেক মানুষের সাথে মিশেছি। কিন্তু আমার চাচা গনি সাহেবের মতো কোন মানুষ কখনো দেখি নি।

৬। শহীদ ওসমান গনির ভাবী জমিলা বেগম সাহেবা বলেন –

আমি এ বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি যখন বাড়িতে পোঁছে তখন তাঁর মাতাপিতা অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি ধরাধরি করে শোয়াবার ব্যবস্থা করি। অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সংবাদটি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পরে। মানুষ দলে দলে বাড়িতে এসে জড়ো হয়। কেউ তাঁর মরদেহ দেখতে না পেলেও বাড়ি এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান। চোখের পানি মুছেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আফসোস করেন। শোকে কয়েকদিন পর্যন্ত বাড়িতে খাবার পাক হয় নি। যেন সবার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি শুনে অদূরে মন্দিরে পূজা বন্ধ করে পূজারীরা আমাদের বাড়িতে ছুটে আসেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ ওসমান গনিকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। আমার পিতা পুস্তক, পৃষ্ঠা নং ৩-৪।
২। ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ খ্রিঃ।
৩। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ, ১৯৬৪ খ্রিঃ।
৪। দৈনিক সংবাদ, ৫ নভেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
৫। পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩০ নভেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
৬। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
৭। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
৮। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
৯। পাক্ষিক আহমদী, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ও ৩১ জানুয়ারি, ১৯৬৪ খ্রিঃ।
১০। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ, ১৯৬৪ খ্রিঃ।
১১। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ জুন, ১৯৭০ খ্রিঃ।
১২। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ, ১৯৬৪ খ্রিঃ।

Prothom Bangali Ahmadi Shaheed Mohammad Osman Ghani

(Memoir of Mohammad Osman Ghani the 1st Bangali Ahmadi Shaheed)

Blessed are those who sacrifice their lives for Allah with the intention to attain 'Nafse Mutmainna' stage. These blessings are bestowed upon Nabi, Siddique, Shaheed & Saleheen.

After the advent of the Promised Messiah (as), many people in different countries embraced Ahmadiyyat and received this divine blessing.

In 1963, at the blessed soil of Brahmanbaria, the first reward of Shahadat was bestowed upon Janab Mohammad Osman Ghani on the eve of the 47th Salana Jalsa which was attacked by the fanatic miscreants. On the same occasion, second Shahadat was embraced by Janab Abdur Rahim of Tarua.

We, the Ahmadies, should know the history of our Martyrs of whom Janab Mohammad Osman Ghani is a source of inspiration to many.

The life-sketch and the sacrifice of Shaheed Janab Mohammad Osman Ghani has been elaborated in this book which has been written in Bangla.

One should go through the book which we hope will be a source of inspiration to every devout Ahmadi. May Allah bless all the Shuhada to the highest honour in the heavens. (Ameen).

ISBN 978-984-991-109-8

9 789849 911098